১২ বছরে পদার্পণ উপলক্ষ্যে

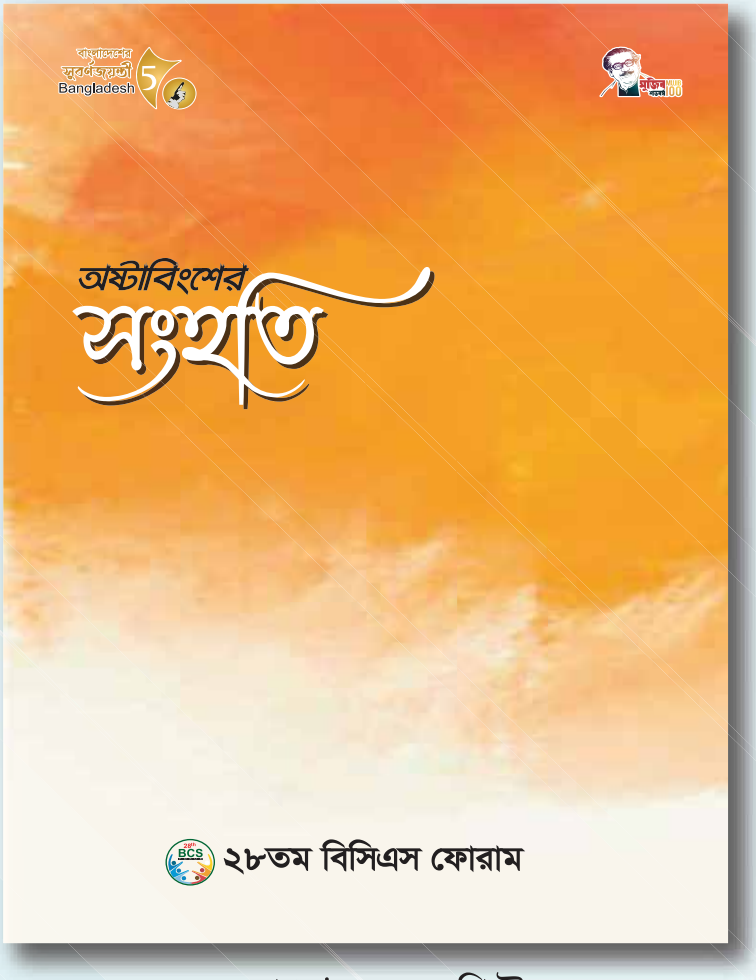

৩য় সংখ্যা * ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

সম্পাদনা পর্ষদ

অষ্টাবিংশের সংহতি

সম্পাদনা উপদেষ্টা	:	**রাজিব দাস** সভাপতি, ২৮তম বিসিএস ফোরাম **ইঞ্জিনিয়ার মোঃ আহসান হাবীব** সাধারণ সম্পাদক, ২৮তম বিসিএস ফোরাম
প্রধান সম্পাদক	:	**আবু সালেহ্ মুহাম্মদ নোমান** সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক, ২৮তম বিসিএস ফোরাম ও সভাপতি, প্রকাশনা উপকমিটি
সদস্য সচিব	:	**মাসরুর-উর-রহমান আবীর** সহ-সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক, ২৮তম বিসিএস ফোরাম
সম্পাদনা সহযোগী	:	**মোঃ গালিব হোসেন** **মোহাম্মদ শাহ আলম** **নাজমুন নাহার** **মোঃ শরিফুল ইসলাম** **মোঃ হুমায়ুন কবির** **সাজেদুর রহমান** **ডা. মধুসূদন মন্ডল** **শাহ মোঃ হাফিজুর রহমান** **ইয়াছমিন আক্তার লিপি** **মোঃ নজরুল ইসলাম**
প্রকাশনায়	:	**২৮তম বিসিএস ফোরাম** E-mail: info@28bcs.org www.28bcs.org
প্রকাশকাল	:	১ জানুয়ারি ২০২২ খ্রিস্টাব্দ
ইভেন্ট পার্টনার	:	মাটি কমিউনিকেশন
প্রচ্ছদ, অঙ্গসজ্জা ও মুদ্রণ	:	মাটি কমিউনিকেশন ৮৫/ডি, পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা।

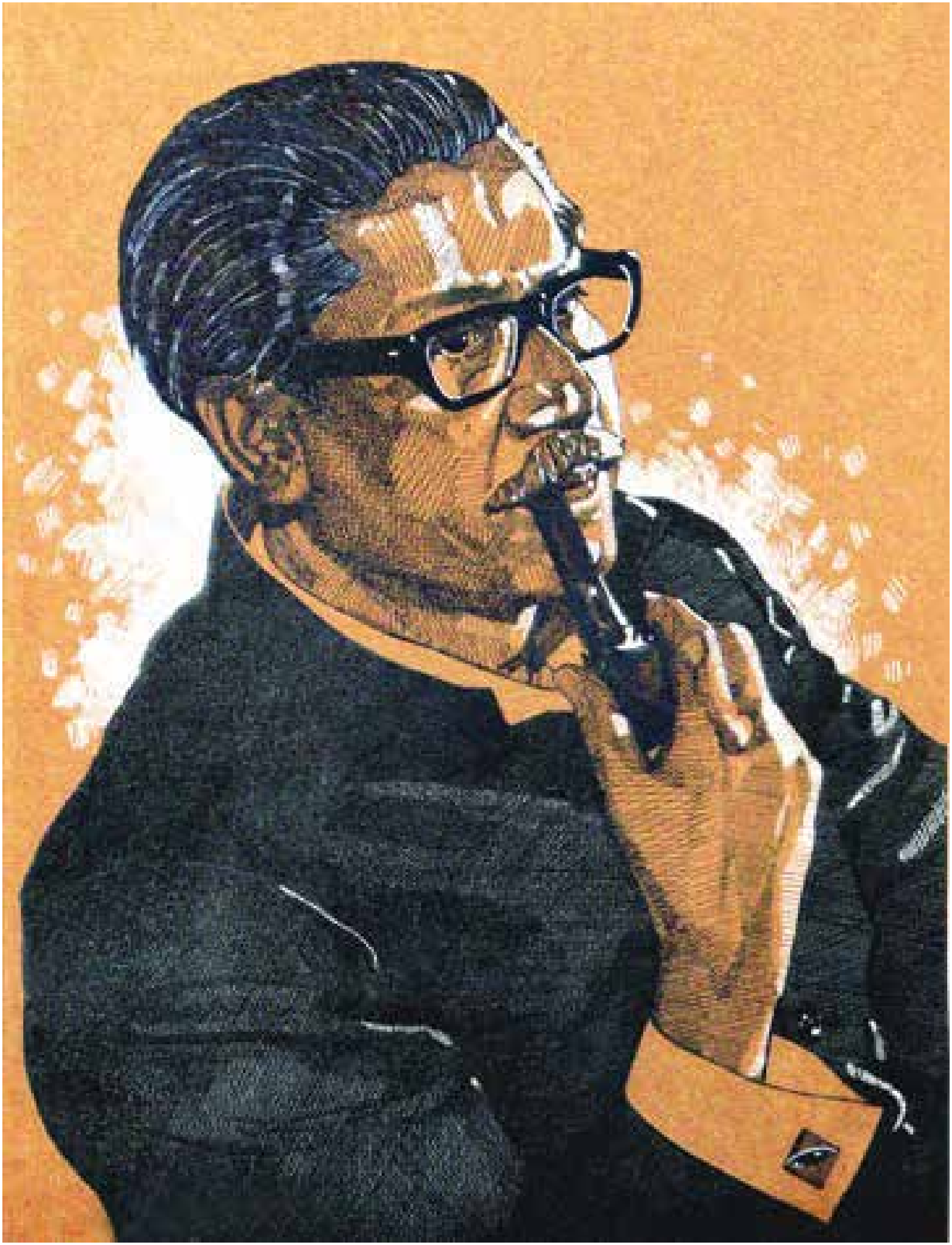

বাণী

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

২৮তম বিসিএস ফোরাম কর্তৃক স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী, মুজিববর্ষ উদযাপন ও দ্বাদশ বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষ্যে স্মরণিকা প্রকাশের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে সরকার ব্যাপক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এসব উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা প্রণয়ন থেকে শুরু করে তা পরিচালনা ও মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের কর্মকর্তাদের রয়েছে নিবিড় সংযোগ। চলমান কোভিড-১৯ অতিমারি উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে কিছুটা বাধাগ্রস্ত করলেও তা থামিয়ে দিতে পারেনি। করোনা মহামারি মোকাবিলা করে দেশের অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রাখতে সিভিল সার্ভিসের কর্মকর্তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। সরকারের উন্নয়ন কর্মসূচির যথাযথ বাস্তবায়ন এবং জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতির ধারাকে অব্যাহত রাখতে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের সদস্যবৃন্দকে সততা, দক্ষতা ও সর্বোপরি পেশাদারিত্বের সাথে দায়িত্ব পালন করতে হবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ। তাই সিভিল সার্ভিসের প্রতিটি সদস্যকে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সব সময় জনস্বার্থকে প্রাধান্য দিতে হবে। অনেক ত্যাগ, তিতিক্ষা এবং লাখো শহীদের রক্তের বিনিময় অর্জিত আমাদের স্বাধীনতা। মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ ও লালন করে এদেশের মাটি ও মানুষের সেবার মানসিকতা নিয়ে সিভিল সার্ভিসের প্রতিটি সদস্যকে কাজ করে যেতে হবে। আমি আশা করি, ২৮তম বিসিএস ফোরাম আন্তক্যাডার সম্প্রীতি বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকারের কর্মপরিকল্পনা দ্রুততার সাথে বাস্তবায়ন ও একটি সুখী-সমৃদ্ধ, উন্নত বাংলাদেশ গঠনে অধিকতর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

আমি ২৮তম বিসিএস ফোরামের সকল সদস্যের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করছি।

জয় বাংলা।
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

বাণী

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৮তম বিসিএস ফোরামের ১২ বছরে পদার্পণ উপলক্ষ্যে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিববর্ষ উদযাপন এবং বার্ষিক মিলনমেলা, স্মরণিকা প্রকাশ ও সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা উদযাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষ্যে আমি ২৮তম ব্যাচের সকল সদস্যকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সারাজীবনের ত্যাগ-তিতিক্ষা ও সংগ্রামের ফসল স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ। এ দেশের মানুষের জন্যই তিনি সারাজীবন কষ্ট করেছেন, জেল-জুলুম-অত্যাচার সহ্য করেছেন। নিজের জীবনে তিনি কিছুই চাননি। সবসময় বাংলাদেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের লক্ষ্যে কাজ করেছেন। স্বাধীনতার পর দেশের অর্থনীতির মূল ভিত্তিও গড়ে দিয়ে গেছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। জাতির পিতা মাত্র সাড়ে তিন বছর সরকার প্রধানের দায়িত্ব পালন করে অর্থনীতির প্রতিটি খাতের জন্য সুস্পষ্ট আর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন দিকনির্দেশনা দিয়ে গেছেন। ধ্বংস-প্রাপ্ত রাস্তাঘাট, ব্রিজ-কালভার্ট, রেললাইন, পোর্ট সচল করে অর্থনীতিতে গতি সঞ্চার করেন। মাত্র ১০ মাসে তাঁর নির্দেশনায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ভিত্তিতে আমাদের সংবিধান প্রণীত হয়। ১৯৭৫ সালে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ৯ শতাংশ অতিক্রম করে।

আওয়ামী লীগ সরকার মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আমরা ২০২১-২০৪১ মেয়াদি দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছি এবং ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছি। আমরাই বিশ্বে প্রথম শত বছরের 'ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০' বাস্তবায়ন শুরু করেছি। বাংলাদেশের উন্নয়ন অভিযাত্রায় 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' এর সুবিধা আজ শহর থেকে প্রান্তিক গ্রাম পর্যায়ে বিস্তৃত হয়েছে। প্রতিটি গ্রামে শহরের নাগরিক সুযোগ-সুবিধা পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। দেশের সকল গৃহহীন-ভূমিহীনের জন্য ঘর তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে। বাংলাদেশের একটি মানুষও আর গৃহহীন থাকবে না। বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে মর্যাদাশীল উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হওয়ার জাতিসংঘের চূড়ান্ত অনুমোদন লাভ করেছে।

আমরা একটি দক্ষ, কার্যকর এবং গতিশীল সিভিল সার্ভিস সৃষ্টিতে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছি। আমরা সরকারি অফিসে সিটিজেন চার্টার বাস্তবায়ন করেছি। দেশের প্রায় ২৫ হাজার ওয়েবসাইট নিয়ে আমরা 'জাতীয় তথ্য বাতায়ন' চালু করেছি। এর ফলে তথ্যপ্রাপ্তির সকল সুবিধা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে গেছে। আমরা সরকারি কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ও সুযোগ-সুবিধা বহুগুণে বাড়িয়েছি। সিভিল সার্ভিসের সদস্যদের জন্য বিদেশে উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। 'জনপ্রশাসন পদক' প্রদানের মাধ্যমে সরকারি কর্মচারীদের উৎসাহ প্রদান করা হচ্ছে। আমাদের সময়োচিত পদক্ষেপের ফলে সিভিল সার্ভিসের সামর্থ্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

২৮তম বিসিএস-এর সদস্যবৃন্দ দেশপ্রেম ও নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে জাতির পিতার স্বপ্নের 'সোনার বাংলাদেশ' গড়তে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবেন- এ আমার প্রত্যাশা।

আমি ২৮তম বিসিএস ফোরাম এর উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

বাণী

بسم الله الرحمن الرحيم

মন্ত্রী
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সিভিল সার্ভিসে ১২ বছরে পদার্পণের এই শুভক্ষণে আমি ২৮তম বিসিএস ফোরামের সকল সদস্যকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

লক্ষ লক্ষ প্রার্থীর সাথে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে অধিকতর মেধাবী ও দক্ষরাই বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে যোগদান করার সুযোগ পেয়ে থাকেন। ক্যাডার সার্ভিসের কর্মকর্তাবৃন্দ তাদের কর্মদক্ষতার মাধ্যমে সরকারের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বহুমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছেন। বর্তমান সরকার সমৃদ্ধ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে আর এরই প্রয়োজনে গ্রহণ করছে বিভিন্ন পদক্ষেপ। তবে সরকারের এ উদ্যোগ যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য সরকারের বিভিন্ন বিভাগসমূহের মাঝে সুষ্ঠু সমন্বয় ও সহযোগিতা প্রয়োজন। এ জন্য সিভিল সার্ভিসের ক্যাডারসমূহের মধ্যে যোগাযোগ, পারস্পরিক সহযোগিতা ও সম্প্রীতির কোনো বিকল্প নেই। ২৮তম বিসিএস ফোরামের ১২ বছরে পদার্পণ উদযাপনের মাধ্যমে আন্তঃক্যাডার সহযোগিতা ও পারস্পরিক সম্প্রীতি আরও বৃদ্ধি পাবে এবং সরকারের কর্মপরিকল্পনার সফল বাস্তবায়নে আগামী দিনগুলোতে অধিকতর অবদান রাখবে বলে প্রত্যাশা রাখি।

২৮তম বিসিএস ফোরামের উত্তরোত্তর সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(আসাদুজ্জামান খান এমপি)

বাণী

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রতিমন্ত্রী
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৮তম বিসিএস ফোরামের ১২তম বর্ষে পদার্পণ, বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিববর্ষ উদযাপন উপলক্ষে সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও ফোরামের বার্ষিক মিলনমেলা আয়োজন এবং এ উপলক্ষে একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

তীব্র প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে মেধাবী ও দক্ষরা ক্যাডার কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ পেয়ে থাকেন। সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে এ সকল কর্মকর্তাদের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

হাজার বছরের শোষণ-বঞ্চনার পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭১ সালে বাঙ্গালি জাতি স্বাধীনতা অর্জন করে। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির লক্ষ্যে সকল সেক্টরে সংস্কারের পাশাপাশি একটি দক্ষ জনবল ও সিভিল সার্ভিস গঠনের লক্ষ্যে জাতির পিতা প্রশাসনিক সংস্কারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

এর ধারাবাহিকতায় জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে একটি দক্ষ ও জনবান্ধব সিভিল সার্ভিস গঠনের পাশাপাশি উন্নয়ন ও অগ্রগতির পথে দেশ দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে। স্বাধীনতার পর ৫০ বছরে বিশেষ করে গত এক যুগে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশের অর্থনীতি, যোগাযোগ অবকাঠামো, তথ্যপ্রযুক্তর প্রসার, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ সকল সেক্টরে অভূতপূর্ব উন্নয়ন ও অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। এই উন্নয়ন ও অগ্রগতির পেছনে দূরদর্শী রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের পাশাপাশি প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। ২৮তম বিসিএস ফোরামের মেধাবী ও তরুণ কর্মকর্তাগণ এই উন্নয়নের একটি বড় অংশের কারিগর। আমি আশা করি এই ফোরামের সকল সদস্য তাদের মেধা, শ্রম, দক্ষতা ও যোগ্যতার সবটুকু দিয়ে দেশ ও দেশের মানুষের সেবা করে যাবেন। বিশেষ করে ২০৪১ সালের মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ তথা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে এই ফোরাম অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি ২৮তম বিসিএস ফোরামের সার্বিক সাফল্য কামনা করি এবং স্মরণিকা প্রকাশ, অনুষ্ঠান আয়োজন ও ফোরামের সাংগঠনিক কর্যক্রমের সাথে জড়িতদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শরীফ আহ্‌মেদ এমপি

বাণী

بسم الله الرحمن الرحيم

সভাপতি
২৮তম বিসিএস ফোরাম

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী **"মুজিববর্ষ"** ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে ২৮তম বিসিএস ফোরামের প্রতিটি সদস্য মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় আজ ঐক্যবদ্ধ।

১লা ডিসেম্বর ২০১০ খ্রি. তারিখে যোগদানের মধ্য দিয়ে ২৮তম বিসিএসের সদস্যবৃন্দ দ্বাদশ বর্ষে পদার্পণ করেছেন। মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে দৃঢ়ভাবে লালন করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর **'ভিশন ২০২১'** ও **'ভিশন ২০৪১'** বাস্তবায়নে সদা তৎপর আমাদের প্রতিটি সদস্য।

'২৮তম বিসিএস ফোরাম' উক্ত ব্যাচের ২৬টি ক্যাডারের দুই হাজারের বেশি সদস্যের পারস্পারিক যোগাযোগ, ব্যক্তিগত সম্পর্ক উন্নয়ন আর পেশাগত অভিজ্ঞতা বিনিময়ের উৎকৃষ্ট একটি প্ল্যাটফর্ম। প্রতিটি সদস্যের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক কল্যাণে ফোরাম প্রতিনিয়ত সচেষ্ট আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।

১২তম বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষ্যে '২৮তম বিসিএস ফোরাম' এর পক্ষ হতে **'অষ্টাবিংশের সংহতি'** নামে আমাদের স্মরণিকার সংখ্যা প্রকাশ হতে যাচ্ছে। সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টায় প্রকাশনাটি সুপাঠ্য হবে বলে মনে করি। উক্ত প্রকাশনার সাথে সম্পৃক্ত সকলকে কৃতজ্ঞতা, আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

দ্বাদশ বর্ষে পদার্পণ সফল হোক- এই কামনায়।

(রাজিব দাস)
সভাপতি
২৮তম বিসিএস ফোরাম
ও
অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার
বাংলাদেশ সচিবালয়- নিরাপত্তা, ঢাকা

বাণী

بسم الله الرحمن الرحيم

সাধারণ সম্পাদক
২৮তম বিসিএস ফোরাম

২৮তম বিসিএস এর সকল ক্যাডার সদস্যদের মাঝে পেশাগত জ্ঞান বিনিময় ও পারস্পরিক যোগাযোগ স্থাপনের অন্যতম একটি প্লাটফর্ম হলো ২৮তম বিসিএস ফোরাম। ২৮তম বিসিএস এর ১২ বছরে পদার্পণ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে স্মরণিকা প্রকাশের এই উদ্যোগ ফোরামের গতিশীলতার প্রমাণক। ১৪ই ফেব্রুয়ারি ২০২০ এ দায়িত্ব নেয়ার পরপরই বিশ্বজুড়ে কোভিড-১৯ মহামারি শুরু হয়। চরম প্রতিকূল এই পরিবেশেও ২৮তম বিসিএস এর সকল সদস্য কর্মদক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

২৮তম বিসিএস ফোরামের প্রত্যেক সদস্য জাতির পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়নে দেশমাতৃকার সেবায় নিজেদের নিয়োজিত করে জনগণের কল্যাণে নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। বাংলাদেশ আজ সারা বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনায় বাংলাদেশ আজ বিশ্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছে। ২৮তম বিসিএস ব্যাচের প্রত্যেক সদস্য বাংলাদেশের এ অগ্রযাত্রার সারথি হতে পেরে অত্যন্ত গর্বিত।

আমি আশা করি ২০৩০ সালের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন এবং ২০৪১ সালের ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত বাংলাদেশ গঠনের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন সার্থকভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য ২৮তম বিসিএস ব্যাচ এর প্রত্যেক সদস্য দেশপ্রেম, আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁদের উপর অর্পিত দায়িত্ব যথার্থভাবে পালন করবেন।

আমি স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী, মুজিববর্ষ উদযাপন এবং ২৮তম বিসিএস ফোরামের ১২ বছরে পদার্পণ উপলক্ষ্যে মিলনমেলা, স্যুভেনির প্রকাশনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্মরণিকার সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

(প্রকৌঃ মোঃ আহসান হাবীব)
সাধারণ সম্পাদক
২৮তম বিসিএস ফোরাম
ও
নির্বাহী প্রকৌশলী
সাভার গণপূর্ত বিভাগ, ঢাকা

সম্পাদকীয়

بسم الله الرحمن الرحيم

আমাদের প্রাণাধিক প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিববর্ষের মহান মাহেন্দ্রক্ষণে ২৮তম বিসিএস ফোরাম উদ্‌যাপন করতে যাচ্ছে ১১ বছর পূর্তি ও ১২ বছরে পদার্পণ অনুষ্ঠান। আমি শুরুতেই বিনম্র শ্রদ্ধা, গভীর ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি ১৫ই আগস্ট নৃশংসভাবে নিহত বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সদস্যবৃন্দসহ আমাদের শ্রেষ্ঠ অর্জন বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতাসংগ্রামের প্রতিটি পর্যায়ে জীবন উৎসর্গকারী বীর শহিদদের। বিজয়ের এ মাহেন্দ্রক্ষণ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে স্মরণিকা 'অষ্টাবিংশের সংহতি'র ৩য় সংখ্যা, যা ২৮তম বিসিএস ফোরামের সদস্যদের সৃজনশীলতা বিকাশের পাশাপাশি আন্তঃক্যাডার সম্প্রীতি জোরদার, জনসেবার মান বৃদ্ধি ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে প্রত্যাশা করছি। বিনিময় তত্ত্ব তথা যৌক্তিক পছন্দ তত্ত্বের মতে, 'সম্পর্কই সম্পদ' ('Relation is asset'), সে প্রেক্ষাপটে 'অষ্টাবিংশের সংহতি' ফোরামের সদস্যদের পেশাদারি মনোভাব, জ্ঞান, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের ক্ষেত্র রচনা করবে এবং অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে সম্পাদনকে সহজতর করবে।

'অষ্টাবিংশের সংহতি' ৩য় সংখ্যা প্রকাশ ২৮তম বিসিএস ফোরামের ১২শ বর্ষে পদার্পণ উদ্‌যাপনকে আরও স্মরণীয় ও বর্ণিল করে রাখবে। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিববর্ষের মহান ক্ষণে স্মরণিকার ৩য় সংখ্যা সম্পাদনা করতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে করছি।

বিশেষভাবে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান এমপি, মাননীয় গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ এমপির প্রতি, যাদের মূল্যবান বাণী স্মরণিকাকে করেছে সমৃদ্ধ এবং প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী হিসেবে আমাদেরকে করেছে অনুপ্রাণিত, হৃদ্ধ।

একই সঙ্গে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি সম্পাদনা পর্ষদের সকল সদস্যের প্রতি, যাদের সহযোগিতায় 'অষ্টাবিংশের সংহতি'র ৩য় সংখ্যা আলোর মুখ দেখছে। বিশষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ফোরামের সভাপতি রাজিব দাস, সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী মোঃ আহসান হাবীব, সহ-সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক ডা. মাসরুর-উর-রহমান আবীর, মোঃ গালিব হোসেন (শিক্ষা), মোঃ শাহ আলম (শিক্ষা), নাজমুন নাহার (শিক্ষা), মোঃ শরিফুল ইসলাম (কৃষি), সাজেদুর রহমান (পুলিশ), ডা. মধুসূদন মণ্ডল, শাহ মোঃ হাফিজুর রহমান (শিক্ষা), ইয়াছমিন আক্তার লিপি (শিক্ষা), মোঃ নজরুল ইসলাম (শিক্ষা) ও সকল ক্যাডারের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যসহ অন্যান্য সহকর্মীর প্রতি, যাদের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও সর্বাত্মক সহযোগিতা ব্যতীত স্মরণিকাটি প্রকাশ করা সম্ভব হতো না।

ফোরামের সদস্যবৃন্দ যারা কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, রম্য রচনা, ভ্রমণকাহিনি ও তথ্যসমৃদ্ধ লেখা দিয়ে স্মরণিকাকে সমৃদ্ধ ও আকর্ষণীয় করেছেন, তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আর্থিক সহায়তা দানের জন্য সম্মানিত বিজ্ঞাপনদাতা ও অনুদান প্রদানকারী সকল কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে স্মরণিকা প্রকাশ করায় কিছু ভুলত্রুটি থাকতে পারে, এজন্য সকলের ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি কামনা করছি এবং গঠনমূলক পরামর্শ প্রত্যাশা করছি।

'অষ্টাবিংশের সংহতি' ফোরামের সকল সদস্যের মাঝে সংহতির সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করবে এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা, ২০৩০ ও প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, ২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে উন্নত-সমৃদ্ধ ও অসাম্প্রদায়িক সোনার বাংলা বিনির্মাণে সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

২৮তম বিসিএস ফোরামের সকল সদস্যের জন্য নিরন্তর ভালোবাসা ও অনিঃশেষ শুভেচ্ছা।

আবু সালেহ্ মুহাম্মদ নোমান
বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা)
সহকারী অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ
ইডেন মহিলা কলেজ, ঢাকা।
পিএইচডি গবেষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক, ২৮তম বিসিএস ফোরাম

যাদের হারিয়েছি

ডা. মোঃ রাশেদুল ইসলাম রাসেল
বিসিএস (স্বাস্থ্য)
ডা. মোঃ রাশেদুল ইসলাম রাসেল ২০০৫ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস সম্পন্ন করেন। ২৮তম বিসিএসে উত্তীর্ণ হয়ে বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডার অফিসার হিসেবে সহকারী সার্জন পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে ১ ডিসেম্বর ২০১০ তারিখে তিনি চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার গোমস্তাপুর উপজেলার রহনপুর ইউনিয়নে যোগদান করেন। ১০ মার্চ ২০১১ তারিখ সকালে নিজ জেলা রাজশাহী থেকে কর্মস্থলে যাওয়ার সময় রাজশাহী-চাপাই মহাসড়কে তাকে বহনকারী অটোর সাথে এক বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই তিনি মর্মান্তিকভাবে মৃত্যুবরণ করেন। আমরা তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করি।

ডা. চৈতী সাহা
বিসিএস (স্বাস্থ্য)
ডা. চৈতী সাহা ২০০৬ সালে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস সম্পন্ন করেন। পরবর্তীতে ২৮তম বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ১ ডিসেম্বর ২০১০ তারিখে বাগেরহাটের রামপালে সহকারী সার্জন পদে যোগদান করেন। ২০১২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে খুলনার শহীদ শেখ আবু নাসের বিশেষায়িত হাসপাতালে কর্মরত অবস্থায় ঢাকার বিয়াম ফাউন্ডেশনে বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে যোগদান করেন। প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে ট্যুরে থাকাকালীন বান্দরবান-কক্সবাজার মহাসড়কে রামুতে এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হন এবং সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১১ দিন পরে মৃত্যুবরণ করেন। আমরা তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি।

এ. এস. এম. মেহেদী হাসান
বিসিএস (কর)
এ. এস. এম. মেহেদী হাসান ১২ ডিসেম্বর ১৯৮২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে ২৮তম বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কর ক্যাডারে সহকারী কমিশনার হিসেবে ১ ডিসেম্বর ২০১০ তারিখে যোগদান করেন। তিনি মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণজনিত কারণে ১৫ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে আকস্মিকভাবে মৃত্যুবরণ করেন।
আমরা তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করি।

যাদের হারিয়েছি

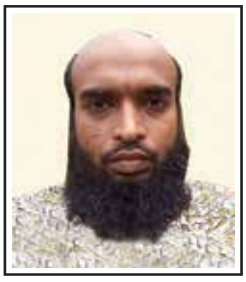

মোঃ রবিউল ইসলাম
বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা)
মোঃ রবিউল ইসলাম ১২ ডিসেম্বর ১৯৮২ সালে নওগাঁ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ২৮তম বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি সাধারণ শিক্ষা ক্যাডার অফিসার হিসেবে রাজশাহী সরকারি কলেজে প্রভাষক পদে ১ ডিসেম্বর ২০১০ তারিখে যোগদান করেন। দুরারোগ্য ব্যাধি ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে ১ ডিসেম্বর ২০১৬ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। আমরা তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করি।

মোঃ শফিকুল ইসলাম
বিসিএস (প্রশাসন)
মোঃ শফিকুল ইসলাম ২৮তম বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রশাসন ক্যাডারে সহকারী কমিশনার হিসেবে ১ ডিসেম্বর ২০১০ তারিখে যোগদান করেন। তিনি চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় ১ জুলাই ২০১৮ তারিখে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।
আমরা তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করি।

নাজমুল হক
বিসিএস (মৎস্য)
নাজমুল হক ২৮তম বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে মৎস্য ক্যাডারে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা হিসেবে ১ ডিসেম্বর ২০১০ তারিখে যোগদান করেন। সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সরিষাবাড়ি, জামালপুর হিসেবে কর্মরত থাকা অবস্থায় তাঁর শরীরে ব্রেন ক্যান্সারের উপস্থিতি শনাক্ত হয়। দীর্ঘদিন ধরে রোগভোগের পরে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।
আমরা তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করি।

কমিটি

সভাপতি

রাজিব দাস

বিসিএস (পুলিশ)
অতিরিক্ত উপ পুলিশ কমিশনার
বাংলাদেশ সচিবালয়- নিরাপত্তা
ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, ঢাকা

সহ-সভাপতি

মোহাম্মদ হায়দার কামরুজ্জামান

বিসিএস (সড়ক ও জনপথ)
ট্রান্সপোর্ট ইঞ্জিনিয়ার
ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ, ঢাকা

সহ-সভাপতি

শরীফ মাহমুদ

বিসিএস (তথ্য)
জনসংযোগ কর্মকর্তা
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা

সহ-সভাপতি

খন্দকার মুহাম্মদ রাশেদ ইফতেখার

বিসিএস (কৃষি)
উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা
কন্ট্রোলরুম, খামারবাড়ি, ঢাকা

সহ-সভাপতি

বিসিএস (প্রশাসন)

সহ-সভাপতি

সাঈদা সুলতানা

বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা)
সহকারী অধ্যাপক, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ
বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ
বকশিবাজার, ঢাকা

সাধারণ সম্পাদক

প্রকৌশলী মোঃ আহসান হাবীব

বিসিএস (গণপূর্ত)
নির্বাহী প্রকৌশলী
সাভার গণপূর্ত বিভাগ, ঢাকা

যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক

ডা. মধুসূদন মন্ডল

বিসিএস (স্বাস্থ্য)
আবাসিক সার্জন, ইউরোলজি বিভাগ
স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ
ও মিটফোর্ড হাসপাতাল, ঢাকা

যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক

দীন মোহাম্মদ

বিসিএস (পুলিশ)
অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার
ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, ঢাকা

যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক

মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম

বিসিএস (শুল্ক ও আবগারী)

উপ-কমিশনার কাস্টমস, এক্সাইজ অ্যান্ড ভ্যাট

লালবাগ ডিভিশন, ঢাকা

যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক

জয় প্রকাশ চৌধুরী

বিসিএস (সড়ক ও জনপথ)

নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ

সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্প-২

যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক

ডা. নিতীশ কৃষ্ণ দাস

বিসিএস (স্বাস্থ্য)

সহকারী অধ্যাপক (ওরাল অ্যান্ড ম্যাক্সিলোফেসিয়াল সার্জারি)

শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল

কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা

সাংগঠনিক সম্পাদক

ড. মোঃ নাজমুল আহসান মুরাদ

বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা)

সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ)

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা

সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক

ডাঃ এম আশিক আউয়াল

বিসিএস (স্বাস্থ্য)

ওএসডি

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, ঢাকা

কোষাধ্যক্ষ

তাপস কুমার চন্দ

বিসিএস (কর)

উপ-কর কমিশনার

কর অঞ্চল-৩, চট্টগ্রাম

সহ-কোষাধ্যক্ষ

নাজমুন নাহার

বিসিএস (পুলিশ)

অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার

অপারেশনস-১

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, ঢাকা

দপ্তর সম্পাদক

ডাঃ যাকিয়া সুলতানা

বিসিএস (স্বাস্থ্য)

রেজিস্ট্রার

জাতীয় চক্ষুবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট

ও হাসপাতাল, ঢাকা

সহ-দপ্তর সম্পাদক

মোঃ আবদুল কাদের

বিসিএস (খাদ্য)

উপ-খাদ্য নিয়ন্ত্রক, পাবনা

প্রচার সম্পাদক
আব্দুল্লাহ শিবলী সাদিক
বিসিএস (তথ্য)
জনসংযোগ কর্মকর্তা
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

সহ-প্রচার সম্পাদক
মোঃ জহুরুল হক
বিসিএস (পুলিশ)
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার
পুলিশ হেডকোয়ার্টার, ঢাকা

তথ্য ও প্রযুক্তি সম্পাদক
প্রকৌশলী মোঃ হেলাল উদ্দিন
বিসিএস (গণপূর্ত)

সহ-তথ্য ও প্রযুক্তি সম্পাদক
মোঃ শরিফুল ইসলাম
বিসিএস (কৃষি)
অতিরিক্ত উপপরিচালক (মনিটরিং)
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ঢাকা

শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদক
তৌফিক শফিকুল ইসলাম
বিসিএস (নিরীক্ষা ও হিসাব)
অতিরিক্ত মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক
অডিট ভবন, কাকরাইল, ঢাকা

সহ-শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদক
মোহাম্মদ মাসুদ পারভেজ
বিসিএস (ডাক)
সহকারী পোস্টমাস্টার জেনারেল
ডাক অধিদপ্তর, ঢাকা

সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক
আবু সালেহ্ মুহাম্মদ নোমান
বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা)
সহকারী অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ
ইডেন মহিলা কলেজ, ঢাকা
পিএইচডি গবেষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সহ-সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক
মাসরুর-উর-রহমান আবীর
বিসিএস (স্বাস্থ্য)
সহকারী অধ্যাপক (প্লাস্টিক সার্জারি)
শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও
প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট, ঢাকা

সাংস্কৃতিক সম্পাদক
মোঃ হুমায়ুন কবীর
বিসিএস (কৃষি)
উপজেলা কৃষি অফিসার (এলআর)
পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ঢাকা

সহ-সাংস্কৃতিক সম্পাদক

মোঃ আবদুল মান্নান

বিসিএস (পরিবার পরিকল্পনা)
সহকারী পরিচালক (পারসোনেল-১)
ও ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার (এইচআরডি)
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ঢাকা

ক্রীড়া সম্পাদক

মোঃ মেসবাহ্ উদ্দিন খান

বিসিএস (কর)
কর অঞ্চল ৮, ঢাকা

সহ-ক্রীড়া সম্পাদক

বিসিএস (প্রশাসন)

সমাজকল্যাণ সম্পাদক

ডা. সুমন কুমার সেন

বিসিএস (স্বাস্থ্য)
কনসালটেন্ট, সার্জারি বিভাগ
কেন্দ্রীয় পুলিশ হাসপাতাল, ঢাকা

সহ-সমাজকল্যাণ সম্পাদক

মোঃ আশরাফুল ইসলাম

বিসিএস (সমবায়)
উপ-নিবন্ধক (প্রশাসন)
বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, রাজশাহী

আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক

তাহ্লীল দেলাওয়ার মুন

বিসিএস (পররাষ্ট্র)
কাউন্সেলর
বাংলাদেশ দূতাবাস
ক্যানবেরা, অস্ট্রেলিয়া

সহ-আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক

শরফুদ্দিন মুহাঃ আবু ইউসুফ

বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা)
সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
সহ: প্রকল্প পরিচালক, মাউশি অধিদপ্তর
ঢাকা

আইন বিষয়ক সম্পাদক

বিসিএস (প্রশাসন)

সহ-আইন বিষয়ক সম্পাদক

ডা. সাজ্জাদ সাগর

বিসিএস (স্বাস্থ্য)
মেডিকেল অফিসার, নাক কান গলা বিভাগ
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা

স্বাস্থ্য সম্পাদক

ডা. জহিরুল ইসলাম

বিসিএস (স্বাস্থ্য)

জুনিয়র কনসালটেন্ট, নাক কান গলা বিভাগ

পটুয়াখালী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

পটুয়াখালী

সহ-স্বাস্থ্য সম্পাদক

ডা. আতিয়া হাসিন

বিসিএস (স্বাস্থ্য)

ডেন্টাল সার্জন, ওএসডি

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, বিএসএমএমইউ

ঢাকা

প্রকৌশল বিষয়ক সম্পাদক

প্রকৌশলী মোঃ রেজাউল করিম

বিসিএস (রেলওয়ে প্রকৌশল)

বিভাগীয় যান্ত্রিক প্রকৌশলী লোকো,

বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম

সহ-প্রকৌশল বিষয়ক সম্পাদক

ফয়েজ আহম্মদ

বিসিএস (সড়ক ও জনপথ)

নির্বাহী প্রকৌশলী

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, ঢাকা

কৃষি বিষয়ক সম্পাদক

মুহাম্মদ বদরুল আলম শাহীন

বিসিএস (মৎস্য)

সহকারী প্রকল্প পরিচালক, সাসটেইনেবল

কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিশারিজ প্রজেক্ট

মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা

সহ-কৃষি বিষয়ক সম্পাদক

মোঃ বসিরুল আল মামুন

বিসিএস (বন)

বিভাগীয় বন কর্মকর্তা

সুন্দরবন পশ্চিম বন বিভাগ, খুলনা

নির্বাহী সদস্য

মোঃ কামরুল ইসলাম

বিসিএস (পুলিশ)

অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার

ওয়ারী জোন

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, ঢাকা

নির্বাহী সদস্য

সৈয়দ ইফতেহার আলী

বিসিএস (আনসার)

উপ পরিচালক (প্রকল্প-প্রশিক্ষণ)

আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী

সদর দপ্তর, ঢাকা

নির্বাহী সদস্য

মোঃ গালিব হোসেন

বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা)

সহকারী অধ্যাপক, পরিসংখ্যান বিভাগ

সরকারি তিতুমীর কলেজ, ঢাকা

নির্বাহী সদস্য

মোঃ আমিনুর ইসলাম

বিসিএস (কৃষি)

অতিরিক্ত উপ-পরিচালক, প্ল্যান্ট প্রোটেকশন উইং

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ঢাকা

নির্বাহী সদস্য

মোহাম্মদ খালেদ সালাহউদ্দিন

বিসিএস (জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল)

নির্বাহী প্রকৌশলী

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা

নির্বাহী সদস্য

নিয়াজ মোর্শেদ

বিসিএস (কর)

উপকর কমিশনার

কর অঞ্চল-৮, ঢাকা

নির্বাহী সদস্য

মোকছেদ হোসেন

বিসিএস (তথ্য)

উপ-বার্তা নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ বেতার

বান্দরবান

নির্বাহী সদস্য

বিসিএস (প্রশাসন)

নির্বাহী সদস্য

মোঃ হাবিবুল্লাহ ফুয়াদ

বিসিএস (স্বাস্থ্য)

মেডিকেল অফিসার

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

ঢাকা

নির্বাহী সদস্য

সাইফুল ইসলাম

বিসিএস (মৎস্য)

সিনিয়র উপজেলা মৎস্য অফিসার

মানিকগঞ্জ সদর

নির্বাহী সদস্য

নাজমুন নাহার

বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা)

সহকারী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক বিভাগ

সরকারি এস ডব্লিউ কলেজ, নারায়ণগঞ্জ

নির্বাহী সদস্য

মোহাম্মদ আরিফুল ইসলাম

বিসিএস (শুল্ক ও আবগারী)

যুগ্ম কমিশনার, ঢাকা দক্ষিণ কমিশনারেট

ঢাকা

নির্বাহী সদস্য

আবদুর রহিম

বিসিএস (বাণিজ্য)

উপ-নিয়ন্ত্রক

আমদানি ও রপ্তানি যুগ্ম-নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, খুলনা

নির্বাচন কমিশন ২০১৯
২৮তম বিসিএস ফোরাম

প্রধান নির্বাচন কমিশনার
এম এ মোমেন মিয়া
বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা)

নির্বাচন কমিশনার
ডা. জহিরুল ইসলাম
বিসিএস (স্বাস্থ্য)

নির্বাচন কমিশনার
প্রকৌশলী মোঃ রাজিবুল ইসলাম
বিসিএস (গণপূর্ত)

নির্বাচন কমিশনার
সাজিদুর রহমান
বিসিএস (পুলিশ)

নির্বাচন কমিশনার
মকসুদ রসুল
বিসিএস (আনসার)

নির্বাচন কমিশনের সাথে সৌজন্য সাক্ষাতে নতুন কার্যকরী কমিটির সদস্য বৃন্দ

কোভিড-১৯ সাপোর্ট টিম

কর্মকর্তার নাম	বর্তমান কর্মস্থল ও ক্যাডার	মোবাইল নং	অধিক্ষেত্র
ডা. তানভির সিদ্দিকী	রংপুর (Dental)	01711461468	রংপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, গাইবান্ধা, নীলফামারী, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়।
ডা. মাহজাবীন জামাল	রংপুর (Health)	01717015888	
লিজা বেগম	রংপুর (Police)	01718172192	
মোঃ সাদাকাত হোসেন	রংপুর (Education)	01720335188	
প্রকৌঃ আবিল আয়াম	নীলফামারী (PWD)	01795114331	
মোঃ রবিউল ইসলাম	নিলফামারী (Police)	01711279960	
অশোক কুমার পাল	নিলফামারী (Police)	01736435645	
প্রকৌঃ তৌহিদুজ্জামান	লালমনিরহাট (PWD)	01916038750	
শাফীয়ার রহমান	ঠাকুরগাঁও (Agriculture)	01715137659	
প্রকৌঃ মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম	নাটোর (PWD)	01711992031	বগুড়া, নাটোর, রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, জয়পুরহাট, নওগাঁ।
মোঃ আবুল হাসনাত	নাটোর (Police)	01713373854	
ডা. মোঃ আবদুল মুমিত সরকার	রাজশাহী (Health)	01718242963	
ডা. মোঃ ফজলুল কবির ভূঁইয়া	রাজশাহী (Health)	01712836989	
সুমন দেব	রাজশাহী (Police)	01743138132	
রাজিবুর রহমান	রাজশাহী (Agriculture)	01712220133	
জাহিদা বেগম	রাজশাহী (Education)	01770026746	
মোঃ মাসুদ রানা	রাজশাহী (Education)	01718738664	
প্রকৌঃ আরিফ জামান	পাবনা (PWD)	01714524318	
ডা. মোঃ মশিউর রহমান	চট্টগ্রাম (Health)	01711079282	চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান।
প্রকৌ: এস এম শাহরিয়ার নেওয়াজ	চট্টগ্রাম (PWD)	01818256051	
প্রকৌ: সানাউল্লাহ শুভ	রাঙ্গামাটি (PWD)	01777910199	
শফিউল্লাহ	রাঙ্গামাটি (Police)	01733338179	
আদনান তাহিয়ান	কক্সবাজার (Police)	01947980981	
চম্পা শাহা	চট্টগ্রাম (Police)	01726150656	
হাসানুজ্জামান মোল্লা	চট্টগ্রাম (Police)	01716844501	
কাউসার সারওয়ার	চট্টগ্রাম (Agriculture)	01712513288	
ওমর ফারুক	বান্দরবান (Agriculture)	01819171839	
সালমা মোস্তফা নুসরাত	চট্টগ্রাম (Education)	01721004840	
মোঃ আবুল কাসেম	কক্সবাজার (Education)	01816307020	
তানভীর সালেহীন ইমন	কুমিল্লা (Police)	01714414744	কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ফেনী, চাঁদপুর, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর।
মোঃ জাহাঙ্গীর আলম	কুমিল্লা (Police)	01714411460	
প্রকৌঃ ইমতিয়াজ আহমেদ	ব্রাহ্মণবাড়িয়া (PWD)	01911751513	
প্রকৌঃ কায়সার সাইখ	চাঁদপুর (PWD)	01912926528	
রেজাউল করিম ভূইয়া	ফেনী (Agriculture)	01713714685	
মোঃ তোফায়েল আহমেদ	কুমিল্লা (Education)	01717100747	
মোঃ আতিকুর রহমান	চাঁদপুর (Education)	01722125625	
ডা. নূরে আলম মজুমদার	চাঁদপুর (Health)	01717378556	
মোতাহার হোসেন	খুলনা (Police)	01711068433	খুলনা, বাগেরহাট, নড়াইল
ডা. কমলেশ	খুলনা (Health)	01717593065	
শরিফুল ইসলাম	খুলনা (Police)	01716934086	
প্রকৌঃ আলী নুরাইন	যশোর (R&HD)	01730782767	
বশির আল মামুন	খুলনা (Forest)	01712339356	

কর্মকর্তার নাম	বর্তমান কর্মস্থল ও ক্যাডার	মোবাইল নং	অধিক্ষেত্র
মোহাম্মদ মাসুদ রানা	নড়াইল (Police)	01712087247	সাতক্ষীরা, যশোর, মাগুরা, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া।
মোসাদ্দেক আলী	খুলনা (Agriculture)	01716009098	
ডা. সাজ্জাদুল ইসলাম	কুষ্টিয়া (Health)	01710358709	
বিষ্ণুপদ সাহা	কুষ্টিয়া (Agriculture)	01748047172	
ডা. আয়শা আক্তার	ঝিনাইদহ (Health)	01712946434	
ডা. মোঃ রোমান বাদশা	শরীয়তপুর (Health)	01710324234	গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, ফরিদপুর, রাজবাড়ী, শরীয়তপুর, কুষ্টিয়া।
কল্যান কুমার	শরীয়তপুর (Agriculture)	01912586226	
প্রকৌঃ অমিত বিশ্বাস	গোপালগঞ্জ (PWD)	01712603301	
সনজয় কুমার বালা	গোপালগঞ্জ (Education)	01716426565	
সুব্রত মণ্ডল	গোপালগঞ্জ (Education)	01682936843	
ফারহানা বিলকিস	ফরিদপুর (Education)	01986650949	
প্রকৌঃ সজীব আহমেদ	হবিগঞ্জ (R&HD)	01730782670	সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ।
সৈলেন চাকমা	হবিগঞ্জ (Police)	01726286746	
ডা. কবির আহমেদ	সিলেট (Health)	01717430372	
সুদিপ্তরয়	সিলেট (Police)	01750079897	
ডা. রিচার্ড কোসটা	সিলেট (Health)	01817576487	
মোহাম্মদ মিনহাজ উদ্দিন	সিলেট (Custom)	01717466999	
মোঃ সাইফুল ইসলাম	সিলেট (Police)	01716327445	
আনিসুজ্জামান	সিলেট (Agriculture)	01711245654	
সাগর বিশ্বাস	সিলেট (Education)	01714527876	
কাজল সিংহ	সিলেট (Tax)	01717650725	
ডা. জসীম উদ্দিন শরিফি	সুনামগঞ্জ (Health)	01712145516	
মোঃ হায়াতুন নবী	সুনামগঞ্জ (Police)	01715967936	
সুব্রত কুমার দাস	মৌলভীবাজার (Agriculture)	01724095825	
ডা. জহিরুল ইসলাম	পটুয়াখালী (Health)	01788554400	বরিশাল, ভোলা, পটুয়াখালী, বরগুনা, পিরোজপুর, ঝালকাঠি।
মোঃ রইছ উদ্দিন	পটুয়াখালী (Police)	01777710811	
প্রকৌঃ হারুন	পটুয়াখালী (PWD)	01717114997	
মোঃ হাসান মোস্তফা স্বপন	পিরোজপুর (Police)	01711196845	
মাহমুদ হাসান	ঝালকাঠি (Police)	01711045382	
রিফাত সিকদার	ঝালকাঠি (Agriculture)	01716879053	
উজ্জল পাল	বরিশাল (Education)	01818422227	
নাসির উদ্দিন	বরিশাল (Agriculture)	01913691751	
ডা. শরীফুল ইসলাম	গাজীপুর (Health)	01612542634	গাজীপুর, কিশোরগঞ্জ, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, শেরপুর, জামালপুর, নেত্রকোনা।
আমিনুল ইসলাম	গাজীপুর (Police)	01780038500	
সুশান্ত সরকার	গাজীপুর (Police)	01913453459	
প্রকৌঃ আল আমিন ইসলাম	টাঙ্গাইল (PWD)	01732175975	
রেজাউর রহমান	টাঙ্গাইল (Police)	01911152070	
কুশল ভৌমিক	টাঙ্গাইল (Education)	01717559392	
মুহাম্মদ মোশাররফ হোসেন	ময়মনসিংহ (Education)	01712833381	
ডা. সজীব তরফদার	ময়মনসিংহ (Health)	01717120130	
মোহাম্মদ শফিউল ইসলাম	ময়মনসিংহ (Police)	01712986787	
একে এম মনিরুল ইসলাম	ময়মনসিংহ (Police)	01717337996	
আনোয়ার হোসেন	কিশোরগঞ্জ (Agriculture)	01916764933	
ডা. ইকরাজুল হাসান	নেত্রকোনা (Health)	01711734303	

কর্মকর্তার নাম	বর্তমান কর্মস্থল ও ক্যাডার	মোবাইল নং	অধিক্ষেত্র
ডা. নিতীশ কৃষ্ণ দাশ	ঢাকা (Dental)	01716127341	ঢাকা, মানিকগঞ্জ, নরসিংদী, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ।
ডা. যাকিয়া সুলতানা নীলা	ঢাকা (Health)	01717545839	
ডা. মধুসূদন মন্ডল	ঢাকা (Health)	01712733278	
ডা. মোঃ সাইদুর রহমান	ঢাকা (Health)	01715041736	
রাশেদ ইফতেখার	ঢাকা (Agriculture)	01742337118	
ড. মোঃ নাজমুল আহসান মুরাদ	ঢাকা (Education)	01717731653	
প্রকৌঃ রাজীবুল ইসলাম	ঢাকা (PWD)	01719618364	
শরীফুল ইসলাম দুলাল	ঢাকা (Agriculture)	01716069692	
সাজেদুর রহমান	ঢাকা (Police)	01712009728	
সাইফুল ইসলাম	মানিকগঞ্জ (Fisheries)	01912420655	
আশরাফুল পরাগ	নরসিংদী (Co-oparative)	01717208308	
মোহাম্মদ বদরুল আলম মোল্লা	মুন্সীগঞ্জ (Police)	01712678929	
এমদাদ হোসেন	মানিকগঞ্জ (Agriculture)	01716098156	
ইউসুফ আলী সরকার	নারায়ণগঞ্জ (Health)	01818244029	

কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে ঘোষিত ২৮তম বিসিএস ডক্টরস (টেলি-মেডিসিন) টিম

ক্র.নং	কর্মকর্তার নাম	মোবাইল নং
০১	ডা. মাসরুর-উর-রহমান আবীর (প্লাস্টিক সার্জারি)	০১৭১১১৮৬৩৫১
০২	ডা. রাহাতুন নাঈম ম্যাগলিন (মেডিসিন)	০১৭৩২৬৪৫৪৮১
০৩	ডা. মেহেদী হাসান (মেডিসিন)	০১৭১৭৫৩১৭১৭
০৪	ডা. মিহির কান্তি অধিকারী (মেডিসিন)	০১৫৫৭৪৩৯৫৩৯
০৫	ডা. আল আমীন (মেডিসিন)	০১৭৩১৩৪৮৯৭৭
০৬	ডা. পীযুষ বিশ্বাস (কার্ডিওলজি)	০১৭১১১৫৯৭৮৬
০৭	ডা. শুভ্র চক্রবর্তী (কার্ডিওলজি)	০১৭১৯৬১৮৩৬৪
০৮	ডা. মধুসূদন মন্ডল (ইউরোলজি)	০১৭১২৭৩৩২৭৮
০৯	ডা. যাকিয়া সুলতানা নীলা (চক্ষু রোগ)	০১৭১৭৫৪৫৮৩৯
১০	ডা. মুমিত সরকার শান্তনু (গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি)	০১৭১৮২৪২৯৬৩
১১	ডা. সুমন কুমার সেন (জেনারেল সার্জারি)	০১৭১১১৮২৯৬৬
১২	ডা. তুহিন তালুকদার (জেনারেল সার্জারি)	০১৭৮৯৬৭২০৭৭
১৩	ডা. জহিরুল ইসলাম (নাক কান ও গলা)	০১৭৮৮৫৫৪৪০০
১৪	ডা. সাজ্জাদ সাগর (নাক কান ও গলা)	০১৭৫১৫৯২১০১

ক্র.নং	কর্মকর্তার নাম	মোবাইল নং
১৫	ডা. দেবব্রত রায় (শিশু রোগ)	০১৮১৬৫৩১৮৮৭
১৬	ডা. আতিকুল ইসলাম (নিউরোমেডিসিন)	০১৯১৫৪৪৯০৮৩
১৭	ডা. নিবেদিতা সাহা (গাইনি অ্যান্ড অবস)	০১৭৩০৭৯৮১৩৩
১৮	ডা. নাজমিন ইসলাম (গাইনি অ্যান্ড অবস)	০১৭১২১৫০১৫৫
১৯	ডা. শারমিন সুলতানা স্বর্না (গাইনি অ্যান্ড অবস)	০১৭১১১৮৬৩১১
২০	ডা. সোহেলী আক্তার (গাইনি অ্যান্ড অবস)	০১৮১৫৫৫৯৫৪৬
২১	ডা. শাওন দত্ত (অর্থোপেডিক সার্জারি)	০১৭৫৭০৮০০৮৬
২২	ডা. সুজিত পাল (অর্থোপেডিক সার্জারি)	০১৬১২১৬১২১৭
২৩	ডা. নিতীশ কৃষ্ণ দাশ (ডেন্টিস্ট্রি)	০১৭১৬১২৭৩৪১
২৪	ডা. আশিক আউয়াল (ডেন্টিস্ট্রি)	০১৭১৬৬০২৭৪১
২৫	ডা. মাহবুব (ডেন্টিস্ট্রি)	০১৭১৭২০৮৩০৮
২৬	ডা. নিশাত আসরাফী (ডেন্টিস্ট্রি)	০১৭১৫০৮৯৬১০
২৭	ডা. আতিয়া হাসিন (ডেন্টিস্ট্রি)	০১৭২৯১৮৯৮৭০

একনজরে ২৮

২৮তম বিসিএস: দিন-তারিখের পথ ধরে

আজ থেকে ১১ বছরেরও বেশি সময় আগে সেই ২০০৮-এর শুরুতে বাংলাদেশের স্নাতক পাস করা লক্ষাধিক স্বপ্নাতুর তরুণ-তরুণী ২৮তম বিসিএস নিয়ে স্বপ্নের জাল বুনে পরিকল্পনার ছক কষেন। এরপর কেটে যায় অনেকগুলো দিন। একে একে পেরিয়ে আসতে হয় নানান পর্যায়ে বিভিন্ন রকম পরীক্ষার ধাপ।
আবারও ফিরে দেখি সেসব স্মৃতিকাতর দিন।

আজ থেকে ১১ বছরেরও বেশি সময় আগে সেই ২০০৮-এর শুরুতে বাংলাদেশের স্নাতক পাস করা লক্ষাধিক স্বপ্নাতুর তরুণ-তরুণী ২৮তম বিসিএস নিয়ে স্বপ্নের জাল বোনে আর পরিকল্পনার ছক কষে। এরপর কেটে যায় অনেকগুলো দিন। একে একে পেরিয়ে আসতে হয় নানান পর্যায়ে বিভিন্ন রকম পরীক্ষার ধাপ।
আবারও ফিরে দেখি সেসব স্মৃতিকাতর দিন।

২২/০১/২০০৮ - ২৮তম বিসিএস পরীক্ষার বিজ্ঞাপন প্রকাশ
১৩/১১/২০০৮ - প্রিলিমিনারি পরীক্ষার সকল কেন্দ্রের আসন ব্যবস্থা প্রকাশ
২৮/১১/২০০৮ - প্রিলিমিনারি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত, মোট ১২০৯৪৬ জন আবেদনকারী
০১/০২/২০০৯ - প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ, ১১৭৮৮ জন প্রাথমিকভাবে বাছাইকৃত
৩০/০৩/২০০৯ - লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ
১৫/০৪/২০০৯ - লিখিত পরীক্ষার সকল কেন্দ্রের হল ও আসন ব্যবস্থা প্রকাশ
৩০/০৪/২০০৯ থেকে ১২/০৫/২০০৯ - আবশ্যিক বিষয়সমূহে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত
২৪/০৫/২০০৯ থেকে ০২/০৬/২০০৯ - পদসংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত
০২/০৯/২০০৯ - লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ, ৫৮৮১ জন উত্তীর্ণ
০৮/০৯/২০০৯ থেকে - মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ
০৪/১০/২০০৯ থেকে ১০/০১/২০১০ - মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত, ৫৭৮৩ জন অংশগ্রহণকারী
০৩/০৬/২০১০ - ২৮তম বিসিএস পরীক্ষার চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ, ৫১০৫ জন উত্তীর্ণ, এর মধ্যে ২১৯০ জন ক্যাডার পদের জন্য সুপারিশকৃত
১১/০৭/২০১০ - স্বাস্থ্য পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ
০৮/০৮/২০১০ থেকে ২৬/০৮/২০১০ - স্বাস্থ্য পরীক্ষা অনুষ্ঠিত
২৫/১০/২০১০ - সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের নব-নিয়োগ শাখা কর্তৃক নিয়োগ প্রজ্ঞাপন প্রকাশ, ২০৮২ জনকে নিয়োগ প্রদান
২৮/১০/২০১০ - নিয়োগ প্রজ্ঞাপনের গেজেট প্রকাশ
০১/১২/২০১০ - ২৮তম বিসিএসে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের পদায়িত কর্মস্থলে যোগদান

অবশেষে দীর্ঘ দুই বছর ১০ মাস ১০ দিনের পথপরিক্রমা শেষে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রথম শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তা হিসেবে যোগদান করেন একঝাঁক গর্বিত উৎসাহী কর্মকর্তা। সে গর্ব সে উৎসাহ নিয়ে তারা সরকারি চাকরিজীবনে পেরিয়ে এসেছেন ১১ বছরেরও বেশি সময়। তাদের কর্মোদ্যোগ, সততা, নিষ্ঠা ও সুচারু দায়িত্ব পালনে সমৃদ্ধ হবে প্রজাতন্ত্র, এগিয়ে যাবে দেশ, উপকৃত হবেন আপামর জনসাধারণ –এ প্রত্যাশা ও প্রার্থনা আমাদের সবার।

১২ বছরে পদার্পণের এই শুভ মুহূর্তে সবার জন্য অনেক অনেক শুভ কামনা।

তথ্য সংকলনে:
মাসরুর-উর-রহমান আবীর
সহকারী অধ্যাপক (প্লাস্টিক সার্জারি), শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট, ঢাকা

সূচিপত্র

আশ্রয়ণ প্রকল্প : অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে শেখ হাসিনা মডেল	এম এম ইমরুল কায়েস (রানা)	২৬
উন্নয়নের ভৌগোলিক চ্যালেঞ্জ : বঙ্গবন্ধুর দিকনির্দেশনা	মুহাম্মদ আলমগীর হাসান	২৮
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ ও কিছু কথা	মোঃ জহুরুল হক	২৯
বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা ভাবনা : একটি পর্যালোচনা	ড. মোঃ নাজমুল আহসান মুরাদ	৩১
ঘুরতে ঘুরতে টুঙ্গিপাড়ায়	মাসরুর-উর-রহমান আবীর	৩৭
Reification of Economy and Society, Climate Change and Covid-19: SDGs as Adaptation	Abu Saleh Mohammad Noman	৪০
মুক্তিযুদ্ধে নারী ও তাদের স্বীকৃতি	রফিকুল ইসলাম	৪৬
তরুণ প্রজন্ম : আত্মনির্ভরশীলতার নতুন সম্ভাবনা	মোঃ নজরুল ইসলাম	৪৮
হরিণের বাণিজ্যিক চাষ	মোঃ কামরুল ইসলাম	৫০
ভিন্নরকম কর	তাপস কুমার চন্দ	৫২
ইউরোপ ভ্রমণের স্মৃতি	মোহাম্মদ শাহ আলম	৫৫
নেকটার থেকে বগুড়ায়	সালমা মোস্তফা নুসরাত	৫৮
ছেলেবেলার কিছু কথা	ডা. আব্দুল্লাহিল আমান	৬৩
Death of a Reader - Banaphul	Mizanur Rahman	৬৫
কৌতুক	এম এ মোমেন মিয়া	৬৭
বঙ্গবন্ধু	মেহেরুন্নেছা শাপলা	৬৮
এক মহাপুরুষ	ইয়াছমিন আক্তার লিপি	৬৯
মুজিবর মুজিবর	ড. মোঃ নাজমুল আহসান মুরাদ	৭০
শতবর্ষে মুজিব	গোপী নাথ ঘোষ	৭১
মুক্তির কবিতা	মোঃ ফজলুল কবির পাভেল	৭২
অবিনাশী সত্তা	মোঃ আতিকুর রহমান	৭৩
মা, তোমাকে বিনম্র শ্রদ্ধা	আবু সালেহ্ মুহাম্মদ নোমান	৭৪
দ্বিত্ব	এ এস এম মূয়ীদুল হাসান	৭৫
তবুও নত হও প্রিয় কবিতারা	ডা. মধুসূদন মন্ডল	৭৬
রঙ্গমঞ্চ	নাফেয়ালা নাসরিন	৭৭
তোমার জন্য	মিজানুর রহমান	৭৮
ভালোবাসা পরিমাপযোগ্য হতো যদি	ডা. নিশাত রিজওয়ানা আশরাফী	৭৯
ফটো গ্যালারি		৮০

আশ্রয়ণ প্রকল্প : অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে শেখ হাসিনা মডেল

এম এম ইমরুল কায়েস (রানা)

বাংলাদেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন এবং পর্যায়ক্রমে সেগুলো বাস্তবায়ন করে যাচ্ছেন।

অদম্য অগ্রযাত্রায় এগিয়ে চলেছে দেশ। এই উন্নয়নের পথে সবচেয়ে বড় বাধা হচ্ছে দরিদ্রতা। জননেত্রী শেখ হাসিনা ২০০৯ সালে প্রধান-মন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের সময় বাংলাদেশের দারিদ্র্যের হার ছিল ৪১.৫ শতাংশ। একটানা তিন মেয়াদে সরকার পরিচালনা করে অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে গত সাড়ে ১২ বছরে তিনি এ হার ২০.৫ শতাংশে নামিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু বাংলাদেশকে উন্নত দেশ হতে হলে দারিদ্র্যের হার আরো কমাতে হবে। দেশের অসহায়-দরিদ্র প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূলধারায় যুক্ত করতে হবে।

'আশ্রয়ণ' প্রকল্পের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভূমিহীন-গৃহহীন ছিন্নমূল মানুষকে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের আওতায় আনছেন। তিনি ঘোষণা দিয়েছেন, 'বাংলাদেশে একজন মানুষও গৃহহীন থাকবে না।' প্রধানমন্ত্রীর এ নির্দেশনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দেশের ৬৪ জেলার ভূমিহীন ও গৃহহীনদের তালিকা করা হয়। এ তালিকায় সংযোজন-বিয়োজন উপজেলা টাস্কফোর্স কমিটির তত্ত্বাবধায়নে একটি চলমান প্রক্রিয়া।

তালিকা অনুযায়ী 'ক শ্রেণি' অর্থাৎ একেবারেই ভূমিহীন ও গৃহহীন দুই লাখ ৯৩ হাজার ৩৬১ পরিবারের তালিকা প্রস্তুত করা হয়। এ ছাড়া যার জমি আছে কিন্তু ঘর নেই অথবা জরাজীর্ণ ও ভঙ্গুর ঘর রয়েছে এমন 'খ শ্রেণি'ভুক্ত পাঁচ লাখ ৯২ হাজার ২৬১টি পরিবারের তালিকা করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ২০২১ সালের জুন পর্যন্ত চার লাখ ৪২ হাজার ৬০৮টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। তালিকাভুক্ত সব পরিবার পর্যায়ক্রমে পুনর্বাসিত হবে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন নোয়াখালী, বর্তমান লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতি উপজেলার চর পোড়াগাছা গ্রাম পরিদর্শন করেন এবং নদীভাঙনকবলিত ভূমিহীন-গৃহহীন অসহায় পরিবারগুলোকে গুচ্ছগ্রামে পুনর্বাসিত করেন। কক্সবাজার ও অন্যান্য উপকূলীয় অঞ্চলে ১৯৯৭ সালের ১৯ মে ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০ মে টেকনাফ উপজেলার সেন্টমার্টিন পরিদর্শন করে ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত গৃহহীন গরিব পরিবারগুলোকে পুনর্বাসনের নির্দেশনা দেন। প্রধানমন্ত্রী সে বছরই দেশের ভূমিহীন ও গৃহহীন মানুষের জন্য 'আশ্রয়ণ' প্রকল্প চালু করেন।

আশ্রয়ণ মানে কেবল আবাসনের ব্যবস্থা নয়; বরং এর পরিধি আরো ব্যাপক ও বিস্তৃত। উপকারভোগীরা দুই শতাংশ করে জমি পেয়েছেন; একটি অর্ধপাকা দুই কক্ষের ঘর পাচ্ছেন; বিনা মূল্যে বিদ্যুৎ সংযোগ লাগছে এখানে এবং এতে রয়েছে গোসলখানা, টয়লেট ও রান্নাঘর। গৃহসহ জমি স্বামী-স্ত্রী উভয়ের নামে যৌথভাবে দলিল করে দেওয়া হয়েছে। প্রকল্প এলাকায় প্রচুর পরিমাণে গাছ লাগানো হচ্ছে। প্রতি ১০টি পরিবারের সুপেয় পানির জন্য থাকছে একটি করে নলকূপ। ফলে ডায়রিয়াসহ পানিবাহিত রোগ থেকে মুক্ত থাকবেন সুবিধাভোগীরা। তাদের স্বাস্থ্যসেবার জন্য নির্মিত হচ্ছে কমিউনিটি ক্লিনিক। আশ্রয়ণের ছেলেমেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। শিশু-কিশোরদের শরীর গঠন ও বিনোদনের জন্য প্রকল্প এলাকায় রয়েছে খেলার মাঠ। একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আধুনিক গ্রামের সব নাগরিক সুবিধাই থাকছে আশ্রয়ণ প্রকল্পে।

উপকারভোগীদের সক্ষমতা ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য দেওয়া হচ্ছে বিভিন্ন পেশামুখী ১০ দিনের প্রশিক্ষণ। বিশেষ করে ব্যারাকে বসবাসকারী সুবিধাভোগীদের মৎস্য চাষ, পাটি বুনন, নার্সারি, নকশিকাঁথা, ওয়েল্ডিং, ইলেকট্রিক ওয়ারিং এবং রিকশা-সাইকেল-ভ্যান গাড়ি মেরামতের মতো ৩২টি পেশায় প্রশিক্ষিত করা হচ্ছে। এ প্রশিক্ষণ চলাকালে তাদের আয়-রোজগারের যেন ব্যাঘাত না ঘটে সে জন্য প্রতিদিন ৭৫০ টাকা করে ভাতা দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণ-পরবর্তী সময়ে উপকারভোগীরা সমবায় সমিতি গঠন করে আয়বর্ধনকারী ব্যবসা বা পেশা চালুর জন্য ৩০ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ পাচ্ছেন। ব্যারাকে পুনর্বাসিত পরিবার প্রতি প্রাথমিকভাবে তিন মাসের ভিজিএফের আওতায় খাদ্য সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। মাতৃত্বকালীন, বয়স্ক, বিধবা বা অন্যান্য সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতায় ভাতা প্রাপ্তিতে অগ্রাধিকার পাচ্ছেন তারা। অর্থাৎ একজন নিঃস্ব ব্যক্তিকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় মানবসম্পদে পরিণত করে আত্মপ্রত্যয়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হচ্ছে।

নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন দরিদ্রতা সম্পর্কে বলেছেন, 'খাদ্য ও অন্যান্য সামাজিক সুবিধাদির ওপর জনগোষ্ঠীর অনুপ্রবেশ বা অধিকার প্রতিষ্ঠাতে অসমর্থ হওয়ার কারণেই অর্থাৎ ফেইলিওর অব এন্টাইটেলমেন্ট বা স্বত্বাধিকার নিশ্চিত করতে ব্যর্থতার কারণে সমাজে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যদশা দেখা দেয়।' প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্পদের সুষম বণ্টনের লক্ষ্যে আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে হতদরিদ্র ভিক্ষুক, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্ত, ভূমিহীন, গৃহহীন, ছিন্নমূল মানুষকে ভূমি ব্যবহারের আওতায় এনে অন্যান্য সামাজিক সুবিধা প্রাপ্তির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। জলবায়ু উদ্বাস্তু, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, তৃতীয় লিঙ্গ, বেদে, দলিত, হরিজনসহ সমাজের পিছিয়ে পড়া অন্যান্য সম্প্রদায়-কও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এ কর্মসূচিতে। বিশ্বে এটি প্রথম ও সর্ববৃহৎ উদ্যোগ, যাতে রাষ্ট্রের পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীকে মূলস্রোতে তুলে আনার জন্য সম্পূর্ণ বিনা মূল্যে বাসস্থান নির্মাণ করে দেওয়া হচ্ছে।

আশ্রয়ণ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমাদের সংবিধানের ১৫ অনুচ্ছেদে বর্ণিত সব নাগরিকের জন্য মৌলিক উপকরণ প্রাপ্তির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ২০১৮ সালের নির্বাচনি ইশতেহারের ৩.১৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী দারিদ্র্য বিমোচন, বৈষম্য হ্রাস এবং সবার জন্য বাসস্থানের অধিকার নিশ্চিত করা হচ্ছে। পরিবেশ ও জলবায়ু উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অঙ্গীকার পূর্ণতা পেয়েছে। আশ্রয়ণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল (এসডিজি) এর ১ নং দারিদ্র্যের অবসান, ২ নং ক্ষুধা নির্মূল, ৩ নং স্বাস্থ্যসেবা, ৪ নং মানসম্মত শিক্ষা, ৫ নং লিঙ্গ সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন, ৬ নং সুপেয় পানি ও স্যানিটেশন, ৮ নং উপযুক্ত কর্মসংস্থান, ১০ নং অসমতা কমিয়ে আনা এবং ১১ নং টেকসই ও নিরাপদ জনবসতির মতো অনেক লক্ষ্য অর্জনে সাফল্য আসছে।

ক্ষুধা ও দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধারণার প্রচলন ছিল। বৈদেশিক সাহায্য, খাদ্য সহায়তা, ত্রাণ প্রদান এবং ক্ষুদ্রঋণের নামে শোষণ ও বঞ্চনার কারণে একজন দরিদ্র ব্যক্তি চরম দারিদ্র্যদশার মধ্যে পতিত হতো। যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যা-লয়ের রাজনৈতিক অর্থনীতির অধ্যাপক ড্যানি রড্রিক পূর্ব এশিয়ার উচ্চ প্রবৃদ্ধির ওপর গবেষণা করে দেখিয়েছেন, এখানে উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনে ভূমির মালিকানা পুনর্বণ্টন গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হিসেবে কাজ করে।

আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে উপকারভোগীরা ঘরসহ ভূমির মালিকানা পাওয়ার পাশাপাশি আয়বর্ধক কাজে সম্পৃক্ত হয়ে স্বাবলম্বী হয়ে উঠছে। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তাদের মেধা ও শ্রম দেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। সুবিধাভোগী ব্যক্তি ও পরিবার হীনম্মন্যতা কাটিয়ে একটি সম্মানজনক জীবন-জীবিকা নির্বাহ করার স্বপ্ন দেখছে। এভাবেই প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে শামিল করছেন দেশরত্ন শেখ হাসিনা।

আশ্রয়ণ প্রকল্প বাংলাদেশের দরিদ্রতা দূর করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য বিমোচনের এই নতুন পদ্ধতি ইতোমধ্যে 'শেখ হাসিনা মডেল' হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। 'শেখ হাসিনা মডেলে'র মূল ছয়টি বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ :
১. উপার্জন ক্ষমতা ও সঞ্চয় বৃদ্ধি করে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করা; ২. সম্মানজনক জীবিকা ও সামাজিক মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠা;
৩. নারীদের ঘরের অর্ধেক মালিকানা দিয়ে নারীর ক্ষমতায়ন; ৪. প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা ও সক্ষমতা বাড়িয়ে মানবসম্পদ উন্নয়ন;
৫. ব্যাপক হারে বনায়ন ও বৃক্ষরোপণ করে পরিবেশের উন্নতি সাধন এবং ৬. গ্রামেই শহরের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের রাজনীতির মূল দর্শনই ছিল দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানো। জাতির পিতার জ্যেষ্ঠ কন্যা সে লক্ষ্য পূরণে দিন-রাত কাজ করে চলেছেন। 'বাদ যাবে না একটি মানুষও'–এই মূলনীতিকে সামনে রেখেই তিনি সব উন্নয়ন পরিকল্পনা সাজিয়েছেন। বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে উত্তরণে জাতিসংঘের চূড়ান্ত সুপারিশ লাভ করেছে। বঙ্গবন্ধুর আজীবন লালিত স্বপ্ন ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত 'সোনার বাংলাদেশ'-এর দিকে ক্রমেই আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। আশা করা যায় উন্নয়নের এ ধারা অব্যাহত থাকলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য ও দূরদর্শী নেতৃত্বে ২০৪১ সালের আগেই বাংলাদেশ উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হবে।

লেখক : বিসিএস (তথ্য), প্রধানমন্ত্রীর সহকারী প্রেস সচিব-১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা

উন্নয়নের ভৌগোলিক চ্যালেঞ্জ : বঙ্গবন্ধুর দিকনির্দেশনা

মুহাম্মদ আলমগীর হাসান

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার রাজনৈতিক জীবনে অবহেলিত মানুষের জীবন মান উন্নয়নে ছিলেন সোচ্চার। আপামর জনগণের উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিদ্যমান ভৌগোলিক চ্যালেঞ্জ চিহ্নিতকরণে তার পর্যবেক্ষণ ছিল বাস্তবানুগ। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয় সম্পর্কে তার প্রস্তাবনা ছিল সুদূরপ্রসারী। ১৯৭০ সালে ১০ অক্টোবর রেডিও পাকিস্তান থেকে প্রচারিত লিখিত ভাষণ এবং তার প্রধান অংশগ্রহণে রচিত আওয়ামী লীগের ঘোষণাপত্র বিশ্লেষণে দেখা যায়, উন্নয়নের ভৌগোলিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় তিনি কতটা দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনৈতিক ছিলেন।

গ্রামীণ মানুষের কর্মসংস্থান : গ্রামের মানুষের কর্মসংস্থান তার বিবেচনায় প্রাধান্য পেয়েছিল। গ্রামে সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্রাকৃতির শিল্প কারখানা গড়ে তুলে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পকে ব্যাপক উৎসাহ দান এবং এসব শিল্পের কাঁচামাল নির্বিঘ্ন সরবরাহ নিশ্চিত করার কথা তিনি বলেছিলেন। তাঁতিরা যেন দেশের সম্পদ হতে পারেন সে জন্য তাদেরকে ন্যায্যমূল্যে উপকরণ সরবরাহ এবং মূলধারার উন্নয়নে তাদের নিয়োজিত করার বিষয়ে তিনি তখনই ভেবে রেখেছিলেন। কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ এবং কৃষি ঋণদানের বিষয়ে তার ভাবনা ছিল সময়ের চেয়ে অগ্রসর।

দরিদ্র নগরবাসীর আবাসন : তৎকালীন পাকিস্তানে নিম্ন আয়ের লোকজন অমানবিক পরিবেশে বাস করত অথচ ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্টগুলো বিত্তবানদের বিলাসবহুল আবাসিক এলাকা নির্মাণে ব্যস্ত থাকত। কিন্তু তিনি দক্ষ নগরবিদের ন্যায় দরিদ্র নগরবাসীর জন্য স্বল্প খরচে বাসগৃহ নির্মাণের প্রস্তাব করেছিলেন। তার এই ভাবনা বাস্তবায়ন করা হলে ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য নগর-মহানগরে বস্তি সমস্যার লাঘব হতো।

সম্পদের সদ্ব্যবহারের রূপরেখা : দেশের প্রান্তিক অঞ্চল বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম, উপকূলীয় অঞ্চল, দ্বীপ এলাকার মানুষজন ভৌগোলিকভাবে পিছিয়ে আছে বঙ্গবন্ধু তা উপলব্ধি করে প্রাসঙ্গিক দিকনির্দেশনা দিয়েছিলেন। তাদেরকে মূলধারার উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত করার উপায় ও করণীয় ভেবে রেখেছিলেন। তা ছাড়া দেশের উন্নয়নে কৃষিব্যবস্থার আধুনিকীকরণ কৃষি বিপ্লবের পূর্বশর্ত বলে গণ্য করেন। খণ্ড খণ্ড ভূমি চাষাবাদের অসুবিধা দূর করতে ভূমির একত্রীকরণের প্রয়োজন অনুভব করে প্রতিটি অঞ্চলে বহুমুখী সমবায় প্রতিষ্ঠান গঠন করার তাগিদ দিয়েছিলেন। জলাভূমির এই দেশে মৎস্য চাষ উন্নয়নের জন্য তিনি পানিসম্পদ বিষয়ক গবেষণা ও প্রশিক্ষণের জন্য নৌ গবেষণা ইনস্টিটিউট স্থাপনের প্রয়োজন বোধ করে অবিলম্বে এটি স্থাপনের দাবি জানিয়েছিলেন।

ভূতাত্ত্বিক জরিপ : তৎকলীন পাকিস্তানে প্রাকৃতিক সম্পদের অনুসন্ধান ও উন্নয়নে অবহেলা করছে উল্লেখ করে বঙ্গবন্ধু ভূতাত্ত্বিক জরিপ চালানোর কথা বলেছিলেন। এতে মূল্যবান খনিজ পাওয়া গেলে তা কার্যকরভাবে ব্যবহার করার দাবি জানিয়েছিলেন।

বন্যা নিয়ন্ত্রণ : প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ এই ভূখণ্ডে অন্যতম দুর্যোগ বন্যা। তাই বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য তিনি জরুরি ভিত্তিতে সুসংহত ও সুষ্ঠু বন্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। যুক্তফ্রন্ট সরকারে থাকাকালীন সময়ে আওয়ামী লীগ 'ক্রুগ মিশন'কে বন্যা নিয়ন্ত্রণে একটি ব্যাপক পরিকল্পনা প্রণয়নের পাকিস্তানে আমন্ত্রণ করার মাধ্যমে এটা স্পষ্ট বোঝা যায়। এমনকি পশ্চিম পাকিস্তানে জলাবদ্ধতা ও লবণাক্ততা দূর করার বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি উত্থাপনে বঙ্গবন্ধুর ঔদার্য প্রকাশ পায়।

বন ও বনজ সম্পদ : নির্বিচারে বনসম্পদ আহরণের ফলে এই মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে, এই ক্ষতিকর অবস্থা উত্তরণের জন্য আওয়ামী লীগের ঘোষণাপত্রে বন জরিপ, বন সংরক্ষণ, নতুন বন সৃজন ও বনজ সম্পদের সদ্ব্যবহার এবং সর্বোপরি বনজ সম্পদ নিয়ে ব্যাপক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কথা বলছিলেন।

নদী পরিচর্যা : নদীমাতৃক এই দেশের মানুষজন যেন এর সুফল ভোগ করতে পারে সে জন্য জালের মতো বিস্তৃত নদীগুলোর সঠিক পরিচর্যার কথা বলেছিলেন।

বঙ্গবন্ধু এসব দিকনির্দেশনা রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার অনেক আগে থেকেই দিয়েছিলেন। এ ক্ষেত্রে তিনি যে নিবিড় হোমওয়ার্ক করেছিলেন তা স্পষ্ট বোঝা যায়। সুদূরপ্রসারী এসব দিকনির্দেশনা তাকে দেশ ও জনমানুষের হৃদয়ের কাছে নিয়ে যেতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে বলে মনে হয়।

তথ্যসূত্র : শেখ মুজিবুর রহমান, 'মুজিবুরের রচনা সমগ্র' বাংলাদেশ কালচারাল ফোরাম, ২০১০, ঢাকা। শেখ হাসিনা, শেখ মুজিব আমার পিতা, আগামী প্রকাশনী, ২০১৫, ঢাকা

লেখক : বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা), সহকারী অধ্যাপক, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ, সরকারি শাহ্ সুলতান কলেজ,বগুড়া

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ ও কিছু কথা

মোঃ জহুরুল হক

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ সম্পর্কে কিছু লেখার পূর্বে প্রথমেই আমি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় স্মরণ করছি ইতিহাসের হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। বাঙালি জাতির হাজার বছরের ইতিহাসে সবচেয়ে মহত্তম ও গৌরবময় ঘটনা হচ্ছে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর আনন্দঘন মুহূর্তে আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি মুক্তিযুদ্ধের সকল বীর সেনানীকে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ ইউনেস্কোর 'মেমোরি অফ দ্য ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্টার'-এ অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে 'ডকুমেন্টারি হেরিটেজ' বা 'বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য' স্বীকৃতি লাভ করায় এ অনন্য অর্জন আজ আমাদের জাতীয় জীবন পেরিয়ে বৈশ্বিক আঙিনায় গর্বের অন্যতম অনুষঙ্গ। ইউনেস্কো পুরো বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যভিত্তিক দলিল সংরক্ষণ করে থাকে। আজ আমরা গর্বিত ও উচ্ছ্বসিত এ কথা ভেবে যে, ইউনেস্কোর মেমোরি অফ দ্য ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্টারে এ পর্যন্ত ৪২৭টি গুরুত্বপূর্ণ নথি সংগৃহীত হয়েছে যার মধ্যে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ একটি।
বাঙালির বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম ও সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে জাতির পিতার এই ভাষণের দিকনির্দেশনাই ছিল সে সময় বজ্রকঠিন জাতীয় ঐক্যের মূল মন্ত্র।

'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ তার বজ্রকণ্ঠের এ ঘোষণা সেদিনের রেসকোর্স ময়দানে সমবেত লাখো মুক্তিকামী মানুষের রক্তে দ্রোহের বান ডেকেছিল। ১৯ মিনিটের সেই উজ্জীবনী ভাষণ শুনে সেদিন সাড়ে সাত কোটি বাঙালি আজন্ম লালিত মুক্তিসংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার শপথ নেয়। তার ভাষণ সেদিন মুক্তিপাগল বাঙালির নিকট ছিল মুক্তির সনদ।
বঙ্গবন্ধুর ভাষণ আজ বিশ্বের জানালা ভেদ করে সারা বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষের নিকট শুভ বারতা নিয়ে ইউনেস্কো কর্তৃক আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেল।

মহান নেতার ঐতিহাসিক ভাষণ বাঙালি জাতির ইতিহাসে চিরন্তন ও সর্বজনীন। সারা বিশ্বের ঐতিহাসিক ভাষণ নিয়ে ২০১৫ সালে কানাডার একজন অধ্যাপকের লেখা গ্রন্থে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ স্থান করে নেওয়ায় সেটি ছিল একাডেমিক স্বীকৃতি। গত ৩০ অক্টোবর ২০১৭ ইউনেস্কো মহাপরিচালক ইরিনা বোকোভারের ঘোষণায় আজ বঙ্গবন্ধুর ভাষণ পেল আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। এই স্বীকৃতিতে আমাদের জাতীয় জীবনে এক গৌরবময় অধ্যায় সূচিত হলো। পৃথিবীর ১২টি ভাষায় বঙ্গবন্ধুর ভাষণটি অনুবাদ করা হয়। নিউজউইক ম্যাগাজিন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাজনীতির কবি হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। আমি মনে করি তার ভাষণ প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে প্রেরণার চিরন্তন উৎস হয়ে থাকবে। কী ছিল না তার ভাষণে? গণতন্ত্র, অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ার দৃঢ় প্রত্যয়, সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠা, মানবাধিকার সব কিছুই তো তার ভাবনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল, যা তিনি তার ভাষণে প্রকাশ করেছেন। প্রতিনিয়ত বঙ্গবন্ধুর ভাষণ নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা শাণিত মন্ত্রে উজ্জীবিত করছে।

আন্তর্জাতিক এ স্বীকৃতির মাধ্যমে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও মানুষের আজন্ম লালিত মুক্তির অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। তাইতো আজও আমারা বঙ্গবন্ধুর সেই ভাষণে প্রতিনিয়ত উজ্জীবিত ও উদ্দীপ্ত হই। যখনই ষড়যন্ত্রকারী দেশবিরোধী অপশক্তির অপতৎপরতায় রক্ত দিয়ে কেনা লাল-সবুজের এই বাংলার আকাশে কালো মেঘের ঘনঘটা দেখতে পাই ঠিক তখনই ৭ই মার্চে দেওয়া বঙ্গবন্ধুর ভাষণের তেজোময়ী শক্তিতে আমরা ঐক্যবদ্ধ হই। ইস্পাত কঠিন শপথে বারবার বলীয়ান হই তারই সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী মমতাময়ী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে।

আপনারা বিগত আড়াই হাজার বছরের বিশ্ব ইতিহাসে সবচেয়ে উদ্দীপনাময়ী এবং প্রভাব বিস্তারকারী ৪১ জন সামরিক-বেসামরিক জাতীয় বীরের বিখ্যাত ভাষণ নিয়ে ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ Jacob F Field-এর We Shall Fight on the Beaches : The Speeches that Inspired History শিরোনামে লন্ডন থেকে প্রকাশিত বইখানি দেখেন তাহলে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে আমাদের গর্ব আরো সহস্র গুণে বেড়ে যাবে। ওই গ্রন্থে যেমন প্রাচীন গ্রিসের আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট, রোমের জুলিয়াস সিজার, ফ্রান্সের নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ও চার্লস দ্য গল, যুক্তরাষ্ট্রের জর্জ ওয়াশিংটন, আব্রাহাম লিংকন, উইন্ড্রো উইলসন ও ফ্রাংকলিন ডি রুজভেল্ট, যুক্তরাজ্যের উইনস্টন চার্চিল, রাশিয়ার ভ্লাদিমির লেনিন, গণচীনের মাও সেতুং, ভিয়েতনামের হো চি মিন প্রমুখ বিশ্বনেতার বক্তব্য রয়েছে ঠিক পাশাপাশি স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের কালজয়ী ভাষণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এর চেয়ে গৌরবের, এর চেয়ে গর্বের, এর চেয়ে মহামূল্যবান সম্পদ আর বাঙালির জন্য কী হতে পারে?

১৮ মিনিটের জগদ্বিখ্যাত ওই ভাষণে বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের ২৩ বছরের রাজনৈতিক ইতিহাস ও বাঙালিদের সার্বিক অবস্থা যুক্তিযুক্তভাবে তুলে ধরেন। তিনি তার ভাষণে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সঙ্গে বাঙালিদের দ্বন্দ্বের স্বরূপ তুলে ধরেন। তিনি শান্তিপূর্ণভাবে বাঙালিদের অধিকার আদায়ের চেষ্টার কথা তুলে ধরেন। অসহযোগ আন্দোলনের পটভূমি ব্যাখ্যা করেন। তিনি তার ভাষণে আগামী দিনের কর্মসূচি ঘোষণা করেন। সারা বাংলায় প্রতিরোধ গড়ে তুলতে বাঙালিকে উদ্বুদ্ধ করেন। তার ভাষণে তিনি প্রজ্ঞার সঙ্গে ইঙ্গিত দেন যে, প্রতিরোধ সংগ্রামই একসময় মুক্তিযুদ্ধে রূপ নেবে। অভিজ্ঞ সমরবিদদের মতো শত্রুর মোকাবেলায় গেরিলা যুদ্ধের কৌশল তিনি তুলে ধরেন তার ভাষণে। তাইতো তিনি ঘোষণা করেন, '...প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘ-াট যা যা আছে সব কিছু আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে।' বঙ্গবন্ধু তার রাজনৈতিক প্রজ্ঞার চূড়ান্ত প্রমাণ রেখেছেন ৭ই মার্চের ভাষণে।

এবার আমি তার ভাষণের উল্লেখযোগ্য কিছু বিষয় তুলে ধরছি। বঙ্গবন্ধুর ভাষণে একদিকে যেমন ছিল শত্রুর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান, অন্যদিকে শান্তিপূর্ণ উপায়ে বাঙালিদের অধিকার আদায়ের প্রচেষ্টা। তাইতো তিনি বলেছেন, '...আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি।'

গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি বঙ্গবন্ধুর শাণিত চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটে যখন তিনি তার বক্তব্যে বলেন, '...যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও একজন যদিও সে হয়, তার ন্যায্য কথা আমরা মেনে নেব।'

তার মানবিকতার উন্নত ধারণা পাই যখন তিনি তার ভাষণে বলেন, 'গরিবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে...'

অসাম্প্রদায়িক চেতনার প্রতি বঙ্গবন্ধুর সুগভীর বিশ্বাস ছিল বলে তিনি অবলীলায় তার বক্তব্যে উল্লেখ করেছেন, '...এই বাংলায় হিন্দু-মুসলমান, বাঙালি নন-বাঙালি, যারা আছে তারা আমাদের ভাই, তাদের রক্ষার দায়িত্ব আমাদের উপরে। আমাদের যেন বদনাম না হয়।'

বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধুর ভাষণে তার দায়িত্ববোধ ও বিচারব্যবস্থার প্রতি তার আস্থার প্রকাশ দেখি যখন তিনি বলেন, '...কী করে আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে, কী করে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, আপনি আসুন, দেখুন, বিচার করুন...'

ক্ষমতার মোহ বঙ্গবন্ধুকে কখনো আকৃষ্ট করেনি। তিনি শুধু বাঙালির অধিকারকে সমুন্নত রাখতে চেয়েছেন বলেই তার ভাষণে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলেছেন, '...আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না। আমরা এ দেশের মানুষের অধিকার চাই।'

জাতির পিতার স্বপ্নের পথেই তারই কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এগিয়ে চলছে বাংলাদেশ। ২০০৮ সালের ১২ ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধুকন্যা জাতীয় নির্বাচনের প্রাক্কালে 'দিন বদলের সনদ' খ্যাত নির্বাচনী ইশতেহারে ঘোষণা করেন 'রূপকল্প ২০২১'। 'রূপকল্প ২০২১'-এর মূল উপজীব্য ছিল ডিজিটাল বাংলাদেশ। ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন আজ আর স্বপ্ন নয়। আজ এটি চরম বাস্তবতা। বিশ্ববাসীর কাছে ডিজিটাল বাংলাদেশ এখন 'দ্য ফিলোসপি অফ রেভল্যুশন' হিসেবে পরিচিত। ডিজিটাল বাংলাদেশ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নের ভিশন এবং বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রার মূর্ত প্রতীক। 'রূপকল্প ২০২১'-এর অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হলো নির্ধারিত সময়ে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করা।

উন্নয়নের লক্ষ্যাভিমুখী পথে গতিষ্ণু ধারায় প্রতিনিয়ত এগিয়ে চলছে বাংলাদেশ। উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রার সতত প্রবহমান ধারাকে নির্বিঘ্ন রাখতে সরকার 'রূপকল্প ২০২১' বাস্তবায়নে নিষ্ঠার সাথে কাজ করে যাচ্ছে। 'রূপকল্প ২০২১'-এর সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার প্রথম প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২১ মেয়াদে) প্রণয়ন করতঃ দেশ থেকে ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতা দূরীকরণসহ অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার পাশাপাশি সুশাসন নিশ্চিত করার মাধ্যমে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার ক্লান্তিহীন প্রয়াসের ফলশ্রুতিতে আমরা ইতোমধ্যে 'রূপকল্প ২০৪১'-এর প্রধান প্রধান লক্ষ্যসমূহ অর্জনের পথে সাফল্যের ধারা অব্যাহত রাখতে পেরেছি। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-২০১৫) বাস্তবায়নের মাধ্যমে ১ জুলাই ২০১৫ বিশ্বব্যাংকের মধ্যম আয়ের দেশের তালিকায় স্থান পায় বাংলাদেশ। পরবর্তীতে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০) বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের তিনটি সূচক যেমন (ক) মাথাপিছু আয় (খ) মানবসম্পদ সূচক ও (গ) অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সূচক অর্থাৎ সবকটি সূচকে নির্ধারিত মানদণ্ড পূরণ করায় ১৭ মার্চ ২০১৮ বঙ্গবন্ধুর ৯৮তম জন্মবার্ষিকীর শুভদিনে জাতিসংঘের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক কাউন্সিল (ECOSOC)-এর উন্নয়ন নীতিমালা বিষয়ক কমিটির (CDP) সেক্রেটারিয়েটের প্রধান রোলান্ড মোলেরাস বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে ওঠার যোগ্যতা অর্জনের স্বীকৃতিপত্র তুলে দেন জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত মাসুদ বিন মোমেনের হাতে। তারপর গত ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে সিডিপির ত্রিবার্ষিক পর্যালোচনা সভায় ৫ বছরের প্রস্তুতিকালসহ ১৯৭৫ সাল থেকে স্বল্পোন্নত দেশের তালিকায় থাকা বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের চূড়ান্ত সুপারিশ লাভ করে। এ অর্জন দেশের ধারাবাহিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাফল্যের এক অনন্য স্বীকৃতি। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী ও জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকীতে এ অর্জন সমগ্র জাতির জন্য মহা আনন্দ ও গৌরবের।

ডিজিটাল বাংলাদেশের হাত ধরে বর্তমানে বাংলাদেশে ই-কর্মাস, ই-এডুকেশন, ই-গভর্ন্যান্স, ই-মেডিসিন, ই-অ্যাগ্রিকালচার জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশে প্রযুক্তির ব্যাপক প্রসার ঘটিয়ে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে সমৃদ্ধ, সুখী, শান্তিপূর্ণ ও উন্নত জনপথে পরিণত করতে সরকার 'রূপকল্প ২০৪১' ঘোষণা করেছে।

আসুন, আমরা নতুন প্রজন্মকে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ শুনতে দিই, জানতে দিই এবং তাদেরকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা শাণিত মন্ত্রে উজ্জীবিত করি। তবেই দেশ গড়ার সংগ্রামে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রত্যয়দীপ্ত কর্মসূচিতে আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ার নিরন্তর উৎসাহ পাব।

আসুন আমরা ২০২১ সালের মধ্যে ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত, দুর্নীতিমুক্ত এবং সমৃদ্ধিশালী বাংলাদেশ গড়ার লড়াইয়ে বঙ্গবন্ধুকন্যা জননেত্রী-মমতাময়ী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পাশে থাকি এবং স্বপ্নের জাল বুনি স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর উৎসবে যেন বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষ উন্নত জীবন পায়।

লেখক : বিসিএস (পুলিশ), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, পুলিশ হেডকোয়ার্টার, ঢাকা

বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা ভাবনা একটি পর্যালোচনা

ড. মোঃ নাজমুল আহসান মুরাদ

'যতকাল রবে পদ্মা যমুনা গৌরী মেঘনা বহমান
ততকাল রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান'

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং বাংলাদেশ একই সুতায় গাঁথা দুটি নাম। বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু এক ও অভিন্ন। তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি। তার নেতৃত্বে এ দেশ স্বাধীন হয়েছে। স্বভাবতই দেশের প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়ে তার চিন্তা ছিল সুগভীর।

বঙ্গবন্ধুর চিন্তা-চেতনায় যতগুলো বিষয় অগ্রাধিকার পেয়েছে এর মধ্যে শিক্ষা অন্যতম। তিনি জানতেন সঠিকভাবে রাষ্ট্র গঠনের পূর্বশর্ত হচ্ছে জাতি-মানস গঠন। আর জাতি-মানস গঠনের পূর্বশর্ত হচ্ছে শিক্ষা। লাল-সবুজের পতাকাখচিত সদ্য স্বাধীন দেশকে তিনি শূন্য থেকে গড়ে তোলার প্রক্রিয়ায় নিরলসভাবে কাজ করেছেন। সে জন্য দেখা যায় সূচনালগ্নে যেসব বিষয় বঙ্গবন্ধুকে বেশি ভাবিয়েছে, তার একটি হচ্ছে শিক্ষা। বঙ্গবন্ধু যথার্থই উপলব্ধি করেছিলেন যে জাতি গঠনের মূল চালিকাশক্তি হবে শিক্ষা এবং শিক্ষক যারা দক্ষ মানুষ গড়ার কারিগর হিসেবে কাজ করে। সে জন্য দেখা যায় বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্র গঠনে শিক্ষার প্রতি অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। বঙ্গবন্ধু বুঝতে পেরেছিলেন যে শিক্ষা ছাড়া দেশ ও জাতি গঠন করা সম্ভব নয়। দেশ গঠন করতে হলে শিক্ষার ওপর জোর দিতে হবে, বিশেষ করে কারিগরি শিক্ষার। নিচে বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা ভাবনা ও এ বিষয়ে পর্যালোচনা উপস্থাপন করা হলো।

বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা ভাবনার পটভূমি

বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা ভাবনা ছিল তার অন্যতম রাজনৈতিক দর্শনের ভিত্তিভূমি। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী আটটি শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদন পেশ করে। সব কমিশন ছিল এ দেশের মানুষের মৌলচেতনা, সমাজ-সংস্কৃতি ও কৃষ্টিবিরোধী। ১৯৭০ সালের নির্বাচনের আগে সে বছরের ২৮ অক্টোবর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রেডিও ও টেলিভিশনে এক নির্বাচনে ভাষণ দেন। তাতে তিনি শিক্ষা সম্বন্ধে নীতিনির্ধারণী বক্তব্য রাখেন : 'সু-সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য শিক্ষা খাতে পুঁজি বিনিয়োগের চাইতে উৎকৃষ্ট বিনিয়োগ আর কিছু হতে পারে না। সে আলোকে ১৯৭৪ সালে একটি সুদূরপ্রসারী শিক্ষার লক্ষ্য নিয়ে তিনি কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। কমিশনের প্রধান পর্যবেক্ষণগুলোর মধ্যে যেসব বিষয় গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরা হয়েছে, সেগুলো হলো : শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, মেধাবীদের শিক্ষকতা পেশার প্রতি আকর্ষিত করার উদ্দেশ্যে শিক্ষকদের জন্য ভালো পারিশ্রমিক নিশ্চিত করা, শিক্ষার সব পর্যায়ে বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম করে তোলার পদক্ষেপ গ্রহণ, ইংরেজি ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক ভাষা শেখার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দেওয়া, শিক্ষা ও গবেষণার মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়নের সহায়ক হিসেবে উচ্চ-শিক্ষাব্যবস্থাকে গড়ে তোলা, জাতীয় উন্নয়নের জন্য ফলিত গবেষণার ওপর জোর দেওয়া এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার পরিবেশ সৃষ্টি করা, সবার জন্য শিক্ষার সমান সুযোগ সৃষ্টি এবং শিক্ষাকে একটি বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচনা করা। এই কমিশন আরো সুপারিশ করেছে যে, প্রতিবছর জাতীয় আয়ের শতকরা ৫ শতাংশ শিক্ষা খাতে ব্যয় করতে হবে এবং ক্রমান্বয়ে তা ৭ শতাংশে বৃদ্ধির প্রস্তাবও দেওয়া হয় এই প্রতিবেদনে। বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা ভাবনাই প্রতিফলিত হয়েছে কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে। বঙ্গবন্ধু সরকার কর্তৃক রিপোর্টটি গৃহীত ও অনুমোদিত হয়েছিল। বলা যায় এটাই ছিল বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা ভাবনা। এবারে বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা ভাবনার বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করে দেখা যাক।

পরীক্ষা ও মূল্যায়ন পদ্ধতি

আদর্শ শিক্ষাব্যবস্থায় শিখন ফল অর্জনের যথাযথ মান যাচাইয়ের আদর্শ পদ্ধতি থাকা আবশ্যক। শিক্ষার মান বা মূল্য নিরূপণ যেকোনো শিক্ষাব্যবস্থার একটি অবিচ্ছিন্ন অংশ। শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের জন্য পূর্বনির্ধারিত উদ্দেশ্যাবলির সঙ্গে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীর পাঠ ব্যবস্থা এবং তার ফলাফল কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ হচ্ছে, উন্নতমানের পরীক্ষা ব্যবস্থা ও পদ্ধতির মাধ্যমে তা বহুলাংশে নিরূপণ করা সম্ভব। বঙ্গবন্ধু সরকার প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চস্তর পর্যন্ত পরীক্ষা গ্রহণের যে রূপরেখা তৈরি করেছিলেন সে প্রসঙ্গে আসা যাক।

প্রাথমিক স্তরে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন বিদ্যালয়ে বছরব্যাপী লেখাপড়া, শ্রেণিকক্ষে কর্মদক্ষতা এবং আচার-আচরণের ওপর নির্ভর করবে। এ পর্যায়ে শিক্ষকগণ স্বল্প সময়ের ব্যবধানে ক্লাস পরীক্ষার ব্যবস্থা করবেন। বছরের শেষে বার্ষিক পরীক্ষা ছাড়াও প্রতিবছর অন্তত তিনটি পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা করবেন। মূল্যায়নের বিভিন্ন ফল সঞ্চয় রেকর্ডে লিপিবদ্ধ করতে হবে। পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণির শেষে বার্ষিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন জেলাভিত্তিক হতে হবে, তবে পরীক্ষা হবে স্কুলভিত্তিক। পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণির শেষে বর্তমান বৃত্তি পরীক্ষা ব্যবস্থা চালু থাকবে। প্রত্যেক স্কুল থেকে অন্তত শতকরা ১০ ভাগ শিক্ষার্থী যাতে এ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে, তার ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমিক স্তরেও প্রাথমিক স্তরের মতো অন্তত পরীক্ষার ওপর গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। বাড়ির কাজ, টিউটরিয়াল, শ্রেণিকক্ষে সাময়িক পরীক্ষা, প্রাকটিক্যাল ও প্রয়োগমূলক ইত্যাদি কাজ ছাড়াও এ স্তরে প্রতিবছর অন্তত চারটি আন্তঃপরীক্ষা গ্রহণ করতে হবে। আন্তঃপরীক্ষার ফল নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ এবং প্রোগ্রামে রিপোর্ট লিপিবদ্ধ করতে হবে।

দশম শ্রেণির শেষে বর্তমান প্রচলিত এসএসসি পরীক্ষা এবং দ্বাদশ শ্রেণির শেষে এইচএসসি পরীক্ষা সংস্কার সাপেক্ষে চালু থাকবে। এসব পরীক্ষায় প্রত্যেক বিষয়ে ১০% নম্বর মৌখিক পরীক্ষার জন্য সংরক্ষিত থাকবে। সার্টিফিকেটে প্রত্যেক বিষয়ের অন্তঃপরীক্ষা ও বহিঃ-পরীক্ষার নম্বর প্রদর্শিত হবে। মাধ্যমিক স্তরের মতো প্রথম ডিগ্রি পর্যায়ের পাস কোর্সে ও অন্তঃপরীক্ষাকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। পাস ডিগ্রি পরীক্ষায় মৌখিক পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকবে এবং এ জন্য প্রতি বিষয়ের পূর্ণ নম্বরের শতকরা ১০ ভাগ সংরক্ষিত হবে।

অনার্স ডিগ্রি এবং মাস্টার্স ডিগ্রি পরীক্ষার ফলাফল অন্তঃপরীক্ষা ও বহিঃপরীক্ষার সমন্বিত ফলাফলের ওপর নির্ভরশীল হবে। শিক্ষকগণ টিউটরিয়াল ক্লাসে, প্রায়োগিক এবং গবেষণামূলক কাজ ইত্যাদির জন্য নম্বর প্রদান করা ছাড়াও প্রতিবছর তিনটি আনুষ্ঠানিক অন্তঃপরীক্ষা গ্রহণ করে নম্বর প্রদান করবেন। মানবিক, বাণিজ্যিক এবং সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়সমূহের প্রত্যেক পেপারে শতকরা ২৫ নম্বর শিক্ষকের অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের জন্য সংরক্ষিত হবে। আর বিজ্ঞানের বিষয়সমূহের প্রত্যেক পেপারে শতকরা ১৫ নম্বর শিক্ষকের অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের জন্য বরাদ্দ থাকবে এবং প্রত্যেক পেপারে শতকরা ২৫ নম্বর প্রাকটিক্যাল কাজের জন্য সংরক্ষিত করা হবে। অনার্স ডিগ্রি ও মাস্টার্স ডিগ্রির শিক্ষার্থীগণকে একটি মৌখিক পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হবে এবং তার জন্য পূর্ণ নম্বরের শতকরা ১০ নম্বর বরাদ্দ রাখতে হবে। প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হওয়ার নম্বর হবে শতকরা ৬০ বা তার বেশি, দ্বিতীয় শ্রেণির নম্বর হতে হবে শতকরা ৬০ থেকে কম অথচ শতকরা ৫০ নম্বর অথবা তার অধিক। শতকরা ৫০ নম্বরের কম অথচ শতকরা ৪০ বা তার অধিক নম্বরপ্রাপ্ত পরীক্ষার্থীরা শুধু 'পাস' বলে পরিগণিত হবে। শতকরা ৪০-এর নিচে যারা নম্বর পাবে, তারা 'অনুত্তীর্ণ' বলে পরিগণিত হবে। এভাবে শিক্ষার প্রতি শাখা এবং স্তরে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা গ্রহণ এবং ফলাফল প্রদানের নীতিমালা তৈরি করে দেয় বঙ্গবন্ধুর সরকার, যা বর্তমানেও কার্যকর পদ্ধতি বলে স্বীকৃত।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গ্রন্থাগার

বঙ্গবন্ধু জানতেন সঠিকভাবে রাষ্ট্র গঠনের পূর্বশর্ত হচ্ছে জাতি-মানস গঠন। আর জাতি-মানস গঠনের পূর্বশর্ত হচ্ছে শিক্ষা। তিনি মানতেন সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের হৃৎপিণ্ড হচ্ছে গ্রন্থাগার। তাই তার কাছে গ্রন্থাগারের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। বঙ্গবন্ধুর গ্রন্থাগার ভাবনা মূলত তার শিক্ষা ভাবনার মধ্যেই অন্তর্নিহিত। গ্রন্থাগার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের হৃৎপিণ্ডস্বরূপ। এ কথার তাৎপর্য অনুধাবন করতেন বলেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিপরিষদের সদস্য থাকাকালীন ৫ ফেব্রুয়ারি সর্বপ্রথম ঢাকায় পাবলিক লাইব্রেরির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তৎকালীন গভর্নর। বঙ্গবন্ধু সেই কেবিনেটের একজন সক্রিয় সদস্য হিসেবে পাবলিক লাইব্রেরি স্থাপনে জোরাল ভূমিকা রাখেন।

প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত কী ধরনের গ্রন্থাগার থাকবে, সে সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু সরকার অত্যন্ত উন্নতমানের রূপরেখা দিয়ে রেখেছিল। বইয়ের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি, বইয়ের প্রতি মর্যাদাবোধ জাগানো এবং পাঠাভ্যাসের বীজ বপনের জন্য ছোটদের হাতে বই তুলে দেওয়ার দায়িত্ব প্রথমে অভিভাবকের এবং পরে স্কুলের ওপর বর্তায়। অথচ আমাদের দেশের অধিকাংশ অভিভাবক এ ব্যাপারে উদাসীন। বঙ্গবন্ধু গঠিত শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছিল, 'অবিলম্বে গণগ্রন্থাগারের মাধ্যমে প্রাথমিক স্কুলে বই পরিবেশনের যথাসম্ভব ব্যবস্থা করতে হবে। এর জন্য দেশের প্রত্যেকটি থানা সদরে একটি গণগ্রন্থাগার স্থাপন করতে হবে। প্রাথমিক স্কুলে বই পরিবেশন এ গ্রন্থাগারের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হবে। প্রত্যেক ইউনিয়নের এক বা একাধিক নির্বাচিত প্রাথমিক স্কুলকে ভ্রাম্যমাণ বইয়ের শিবিররূপে ব্যবহার করতে হবে। থানা গ্রন্থাগার থেকে বই প্রেরণ করা হবে এ শিবিরে। এখান থেকে এলাকাভুক্ত প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকগণ নিজেদের স্কুলের চাহিদা অনুযায়ী বই সংগ্রহ করবেন এবং ব্যবহারান্তে এখানেই ফেরত দেবেন। অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী প্রাথমিক স্কুলে থানা গ্রন্থাগার থেকে সরাসরি এই পরিবেশন চলবে।

থানা গ্রন্থাগার স্থাপনের ব্যয়ভার বহন করবে জাতীয় সরকার। আমাদের জাতীয় লক্ষ্য হতে হবে দেশের প্রত্যেকটি প্রাথমিক স্কুলে গ্রন্থাগার স্থাপন। প্রাথমিক স্কুলের প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত শ্রেণিকক্ষে উন্মুক্ত শেলফে শিক্ষার্থীদের জন্য বইপুস্তক রাখার ব্যবস্থা বাঞ্ছনীয়। এসব শ্রেণির শিক্ষকরা শিক্ষার্থীর কাছে বইপুস্তক পরিবেশন করবেন।' প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষার্থীদের জন্য যে পাঠাগারের রূপকল্প বঙ্গবন্ধু দিয়েছিলেন, আজও তা পূরণ হয়নি।

মাধ্যমিক স্কুলের গ্রন্থাগারের ব্যাপারেও বঙ্গবন্ধুর ভাবনা ছিল সুদূরপ্রসারী। বঙ্গবন্ধু গঠিত শিক্ষা কমিশনের পক্ষ থেকে যে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, সে পরামর্শ প্রকৃতপক্ষে বঙ্গবন্ধুরই মনের কথা। রিপোর্টে বলা হয়েছে 'মাধ্যমিক স্কুলের গ্রন্থাগারগুলো নানা কারণে অচল হয়ে পড়েছে। মাধ্যমিক স্কুলের গ্রন্থাগারে বহু পুরাতন জরাজীর্ণ, কীটদৃষ্ট অকেজো বইয়ের গাদায় পড়ে নতুন বইগুলোও নষ্ট হয়ে যায়। স্থান বা আলমারির অভাবে অকেজো বইগুলো আলাদা করা সম্ভব হয় না। কমিশন মনে করে মাধ্যমিক স্কুলের গ্রন্থাগার মামুলি উন্নয়ন বা জোড়াতালির ব্যাপার নয়, একে সম্পূর্ণরূপে নতুন করে গড়ে তুলতে হবে।'

কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার একটি অবশ্যম্ভাবী বিষয়। বঙ্গবন্ধু গঠিত শিক্ষা কমিশনের মতে, কলেজ গ্রন্থাগারগুলোর দৈন্য মূলত মাধ্যমিক স্কুল গ্রন্থাগারের দৈন্যের মতোই। এখানেও স্থানাভাব প্রকট। কলেজ গ্রন্থাগারের উন্নয়নের নিম্নতম মান সম্পর্কে কমিশনের সুপারিশ ছিল 'কলেজ গ্রন্থাগারের জন্য আলাদা ভবন নির্মাণ অপরিহার্য। কলেজ গ্রন্থাগার সকাল ৮টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত খোলা রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।'

বঙ্গবন্ধু গঠিত শিক্ষা কমিশন বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে গ্রন্থাগার নিয়েও তাদের অসন্তোষ প্রকাশ করেছিল। কমিশন অভিমত ব্যক্ত করেছিল 'বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের গ্রন্থাগার উন্নয়নের ব্যাপারে অবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়।' কমিশন বলেছিল 'বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বই, সাময়িকীর বরাদ্দ বাড়াতে হবে, গবেষণা কর্মকে জোরদার করার জন্য রেফারেন্স বিভাগকে শক্তিশালী করতে হবে এবং বিদেশি বই, ফিল্ম ইত্যাদি আমদানির জন্য পর্যাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রা ও সরকারি আনুকূল্যের প্রয়োজন হবে।' ভালো গ্রন্থাগার করতে হলে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উন্নতমানের গ্রন্থাগারিক প্রয়োজন। চাহিদা পূরণের পক্ষে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা অপরিহার্য। কমিশনের সুপারিশ ছিল 'যোগ্যতাসম্পন্ন গ্রন্থাগারিকদের পদমর্যাদা ও পারিশ্রমিকের ব্যাপারে শিক্ষকদের পর্যায়ভুক্ত করা উচিত।'

শিক্ষা সৌকর্যের গরজে শিক্ষাঙ্গনে মিউজিয়ামের প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে। জাতীয় জীবনের ও ঐতিহ্যের বিবর্তনের রূপরেখা মিউজিয়ামে যথাসম্ভব বিবৃত হয়। তাই শিক্ষাঙ্গনে মিউজিয়ামের সাহায্যে শিক্ষাদান পর্ব অধিকতর প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

শিক্ষাক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধার সমতাবিধান

বঙ্গবন্ধু গঠিত শিক্ষা কমিশন থেকে বলা হয়েছিল, দেশে শিক্ষা বিস্তারের বৃহত্তর স্বার্থে শিক্ষা ক্ষেত্রে শ্রেণিবৈষম্য দূর করে সুযোগ-সুবিধার সমতা বিধান করতে হবে। পিতা-মাতার আর্থিক অবস্থা, বাসস্থান, ধর্ম প্রভৃতি কারণে যেন কারো প্রতিভার যথাযথ বিকাশ ও দক্ষতা অর্জনের সুযোগ ব্যাহত না হয়, তা শিক্ষাব্যবস্থায় নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধার সমতা বিধানের লক্ষ্য অর্জনে দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় বিভিন্ন কর্মপন্থা অবলম্বন করতে হবে। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করতে হলে বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েদের প্রেরণের জন্য মাতা-পিতার যে অতিরিক্ত ব্যয় হবে, তা লাঘব করার ব্যবস্থা করতে হবে। এ জন্য স্বল্পমূল্যে পাঠ্যপুস্তক, অতিপ্রয়োজনীয় শিক্ষা-উপকরণ ও স্কুল ইউনিফর্ম ইত্যাদি সরবরাহ করতে হবে। তা ছাড়া স্বল্পমূল্যে দুপুরে টিফিনের ব্যবস্থা করলে তাতে একটা ভালো ফল পাওয়া যাবে।

ছাত্রছাত্রীদের প্রতিভা, প্রবণতা ও আগ্রহের পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহারের জন্য মাধ্যমিক স্তর থেকে বহুমুখী শিক্ষাক্রমের ব্যবস্থা থাকবে। তাই মাধ্যমিকে বিভিন্ন বৃত্তিমূলক এবং এ স্তর থেকে বহুমুখী শিক্ষাক্রমের ব্যবস্থা করতে হবে। উচ্চতর শিক্ষায় ভর্তির ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার ফলাফলের সঙ্গে উৎপাদনমুখী শ্রম-অভিজ্ঞতা ও সমাজসেবার অভিজ্ঞতাকে গুরুত্ব দিতে হবে।

যাদের মেধা ও প্রতিভা উচ্চমানের তাদের জন্য উপযুক্ত উচ্চ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে সরকারকে মাধ্যমিক স্তর থেকে মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের জন্য ব্যাপক হারে বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করতে হবে, গ্রামাঞ্চলে নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তান-সন্ততি যাতে উচ্চতর বা পেশাগত শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হয়, সে জন্য মেধাবী গরিব শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রাবাসের সম্পূর্ণ ব্যয় রাষ্ট্রকে বহন করতে হবে।

বঙ্গবন্ধুর সরকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ ও রাষ্ট্রীয়করণের মাধ্যমে সকল শিক্ষকদের বেতন ও সুযোগ-সুবিধা, শিক্ষা-উপকরণ এবং শিক্ষাদানের মানের যে বিশাল বৈষম্য বিদ্যমান, তা দূর করার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল। বলা হয়েছিল যে, যত দিন সম্পূর্ণ জাতীয়করণ ও রাষ্ট্রায়ত্তকরণ সম্ভব না হয়, তত দিন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মানের উন্নয়নের জন্য অধিকমাত্রায় রাষ্ট্রীয় সাহায্যের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

ভৌগোলিক অবস্থান ও জনসংখ্যার সাথে সংগতি রেখে এবং জাতীয় প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়াতে হবে। বিশেষত মেয়েদের মধ্যে দ্রুতহারে শিক্ষা বিস্তার অতীব প্রয়োজন সমাজের কল্যাণের স্বার্থে। বঙ্গবন্ধু সরকারের আমলে দেশের সর্বস্তরে সমমানের শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য যথাযথ অগ্রাধিকার নির্ণয় করে পর্যায়ক্রমে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়, যাতে ১৯৮৫ সালের মধ্যে দেশে উচ্চতম স্তর পর্যন্ত সমমানের শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশের নিরক্ষরতা দূরীকরণের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর সরকার বয়স্ক শিক্ষা ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু করেন; নারীশিক্ষা, শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছুটির মধ্যে কোনো রকম সমন্বয় ছিল না। ছুটির ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধন করা হয়।

শিক্ষক প্রশিক্ষণ

বঙ্গবন্ধু শিক্ষক প্রশিক্ষণের ওপর যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করেছিলেন। তার সরকার গঠিত কুদরাত-এ-খুদা কমিশনের প্রধান পর্যবেক্ষণগুলোর মধ্যে শিক্ষক প্রশিক্ষণের বিষয়ও গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরা হয়েছে। প্রতিবেদনে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, মেধাবীদের শিক্ষকতা পেশার প্রতি আকর্ষিত করাকে উদ্দেশ্যে শিক্ষকদের জন্য ভালো পারিশ্রমিক নিশ্চিত করা, শিক্ষার সব পর্যায়ে বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম করে তোলার পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়ে সুপারিশ করা হয়। কমিশনের সুপারিশ বঙ্গবন্ধুর সরকার গ্রহণ করেছিল। বঙ্গবন্ধু বিশ্বাস করতেন জাতীয় জীবনে উপযুক্ত শিক্ষকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষাব্যবস্থার গুণগত উৎকর্ষ শিক্ষকের সুষ্ঠু পেশাগত শিক্ষার ওপর নির্ভরশীল। উন্নত রাষ্ট্রসমূহে শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য শিক্ষক-শিক্ষণের যে সকল আধুনিক রীতি ও পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে, সেগুলোকে প্রয়োজনমতো প্রয়োগ করে আমাদের দেশের উপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা বঙ্গবন্ধু প্রায়ই বলতেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে শিক্ষক-শিক্ষণের যাবতীয় বিষয়ে পরামর্শ দেওয়ার জন্য তিনি একটি জাতীয় শিক্ষা উপদেষ্টা কাউন্সিল গঠনের পরামর্শ দিয়েছিলেন। এ থেকেই উপলব্ধি করা যায় শিক্ষক-শিক্ষণের বিষয়ে বঙ্গবন্ধু কতটা সচেতন ছিলেন।

বঙ্গবন্ধুর গণমুখী শিক্ষা

বঙ্গবন্ধু গণমুখী শিক্ষার অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং এ বিষয়ে কার্যকরী যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। গণমুখী শিক্ষা বলতে সাধারণভাবে জনগণের জন্য জনগণের প্রয়োজনীয় শিক্ষাকে বোঝায়। এর প্রধান লক্ষ্য, দেশের শিক্ষাদানযোগ্য প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে নূন্যতমপক্ষে নিরক্ষরতা থেকে মুক্ত করা বা স্বাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন করে তোলা এবং সবার জন্য শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করা। উপরন্তু লব্ধ শিক্ষা যাতে ব্যক্তি ও সমাজের চাহিদা যেমন জনকল্যাণ, দেশ ও জাতির উন্নতি, সমৃদ্ধি এবং উৎকর্ষ সাধনে নির্দেশিত হয়, সে বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা। তাই ব্যক্তির ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা, সমাজ-চাহিদা ও জাতীয় স্বার্থ উপেক্ষা করে স্বল্পসংখ্যক শিক্ষিত বা 'এলিট' সৃষ্টি এ শিক্ষা নীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী যেমনটি ছিল ১৮৩৫ সালে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন আমলে ভারতে Meaulay-এর প্রবর্তিত শিক্ষানীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন করার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য শুধু জাতীয় মুক্তি বা রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনই ছিল না, তা ছিল বাঙালি জাতির সার্বিক মুক্তির লক্ষ্যে নির্দেশিত। অর্থাৎ স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র থেকে জনগণের রাষ্ট্র। এর সমুদয় নীতি বা কর্মকাণ্ড জনস্বার্থে বা জনকল্যাণে পরিচালিত হবে। ১৯৭১-এর সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ সে আকাঙ্ক্ষাকে গণচেতনায় পরিণত করে। তাই আমাদের নতুন রাষ্ট্র গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের নামে 'গণ' শব্দের প্রয়োগ। রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতি (গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদ) অনুযায়ী এই রাষ্ট্রের শিক্ষানীতি অবশ্যই গণমুখী হওয়ার কথা। বঙ্গবন্ধু সরকার কর্তৃক ১৯৭২ সালে প্রণীত বাংলাদেশের সংবিধানে এর সর্বোচ্চ স্বীকৃতি আমরা দেখতে পাই। এ সম্পর্কে সংবিধানের ১৭ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে রাষ্ট্র ক. একই পদ্ধতির গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য; খ. সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সংগতিপূর্ণ করিবার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছা প্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য; গ. আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

গণমুখী শিক্ষা সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুর দৃষ্টি ছিল অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন। 'সবার জন্য শিক্ষা' ব্যতীত আমাদের উন্নতি অগ্রগতির যে উপায় নেই, তা তিনি যথার্থই উপলব্ধি করেছিলেন। শিক্ষা বঙ্গবন্ধুর কাছে এতটাই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, তিনি একে 'উৎকৃষ্ট বিনিয়োগ' হিসেবে দেখেছেন। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বেতার-টেলিভিশন বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন, 'সুষ্ঠু সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলবার জন্য শিক্ষা খাতে পুঁজি বিনিয়োগের চাইতে উৎকৃষ্ট বিনিয়োগ আর কিছু হতে পারে না।'

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু

বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করা অপরিহার্য বিবেচনা করেছিলেন, যা তার বিভিন্ন ভাষণ ও পরবর্তীতে গৃহীত কর্মসূচিতে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেন ১৯৪৭ সালের পর বাংলাদেশের প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ায় অক্ষরজ্ঞানহীন মানুষের সংখ্যা বেড়েছে। এটা ভয়াবহ সত্য। আমাদের জনসংখ্যার শতকরা ৮০ ভাগ অক্ষরজ্ঞানহীন। প্রতিবছর ১০ লাখেরও অধিক নিরক্ষর লোক বাড়ছে। জাতির অর্ধেকেরও বেশি শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। শতকরা মাত্র ১৮ জন বালক ও ছয়জন বালিকা প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করছে। জাতীয় উৎপাদনের শতকরা কমপক্ষে ৪ ভাগ সম্পদ শিক্ষা খাতে ব্যয় হওয়া প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি। কলেজ ও স্কুল শিক্ষকদের, বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করতে হবে। নিরক্ষরতা অবশ্যই দূর করতে হবে। পাঁচ বছর বয়স্ক শিশুদের বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষাদানের জন্য একটা 'ক্রাশ প্রোগ্রাম' চালু করতে হবে। দ্রুত মেডিক্যাল ও কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়সহ নয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। দারিদ্র্য যাতে উচ্চশিক্ষার জন্য মেধাবী ছাত্রদের অভিশাপ হয়ে না দাঁড়ায় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।'

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু সরকার গণমুখী শিক্ষার বিষয়কে শুধু সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিয়েই থেমে থাকেনি বরং নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এ লক্ষ্যে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত স্বাধীন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুই প্রথম শিক্ষাব্যবস্থা জাতীয়করণ করেন। এর মধ্যে দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ, ১১ হাজার নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন এবং শিক্ষা খাতে সর্বোচ্চ বাজেট বরাদ্দ। জাতির জন্য একটি গণমুখী শিক্ষাব্যবস্থা যে কত আবশ্যক তা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বঙ্গবন্ধু। তিনি প্রায় ৩৮ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এক লাখ ৬২ হাজার শিক্ষককে জাতীয়করণের অনুমতি দিলে অর্থমন্ত্রী অর্থসংকটের কথা বলেন। তখন বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'আমার সোনার বাংলা গড়তে হলে সোনার মানুষ চাই।' শিক্ষকরা হলেন 'সোনার মানুষ' গড়ার কারিগর। শিক্ষকদের পেটে ক্ষুধা রেখে সোনার মানুষ তৈরি করা সম্ভব নয়। যেখান থেকে পারো, টাকার ব্যবস্থা করো। শিক্ষাব্যবস্থা জাতীয়করণ করতে হবে। মানুষ যখন অশিক্ষিত হয়ে থাকে, তখন সে জাতির জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। আর মানুষ যখন শিক্ষা ও দক্ষতা অর্জন করে, তখন সে মানব-সম্পদে পরিণত হয়।' আমাদের জন্য শিক্ষাই উন্নতি ও অগ্রগতির একমাত্র সোপান। আমাদের দেশে সম্পদের অভাব রয়েছে। জনসংখ্যা প্রচুর। বঙ্গবন্ধু শিক্ষার মাধ্যমে মানুষকে সম্পদে রূপান্তরিত করতে চেয়েছিলেন।

বঙ্গবন্ধু বিশ্বাস করতেন, শিক্ষা ছাড়া কোনো জাতির উন্নতি করা সম্ভব নয়। তার ভাষায় 'শিক্ষা হচ্ছে বড় অস্ত্র যা যেকোনো দেশকে বদলে দিতে পারে। তিনি উদাহরণ দিয়ে বলতেন জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, সিঙ্গাপুরের মতো প্রাকৃতিক সম্পদবিহীন দেশ শুধু মানবসম্পদ সৃষ্টি করে যদি উন্নত দেশ হতে পারে, তাহলে বাংলাদেশও একদিন উন্নত দেশ হবে।'

বঙ্গবন্ধু দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন শিক্ষায় সব মানুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করতে হবে; শিক্ষার ব্যয়ভার মূলত সরকারকেই বহন করতে হবে; ছাত্রছাত্রীদের চরিত্র গঠন, তাদের মধ্যে দেশপ্রেম সৃষ্টি এবং তাদেরকে মানবতাবাদে উদ্বুদ্ধ করতে শিক্ষা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে; শিক্ষাদানের মাধ্যম হতে হবে মূলত মাতৃভাষা অর্থাৎ বাংলা ভাষা; শিক্ষার প্রাথমিক পর্যায়ে একমুখী শিক্ষাব্যবস্থা চালু করতে হবে; বিজ্ঞান, কৃষি ও প্রকৌশল শিক্ষার ওপর জোর দিতে হবে; এবং শিক্ষায় ব্যয় বরাদ্দ বাড়াতে হবে। শুরুতে দেশের মোট জাতীয় আয়ের শতকরা ৫ ভাগ এবং ভবিষ্যতে তা ৭ ভাগে উন্নীত করতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং গবেষণা ও মুক্তবুদ্ধি চর্চার ক্ষেত্র তৈরি

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা ছাড়াও বঙ্গবন্ধু উল্লেখযোগ্য কিছু কাজ করেছেন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে নিয়ে। এর একটি বড় উদাহরণ হচ্ছে, ১৯৬২ সালে তৎকালীন আইয়ুব সরকার বিশ্ববিদ্যালসমূহের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপের লক্ষ্যে একটি অধ্যাদেশ জারি করেছিল যাকে 'কালো আইন' হিসেবে অভিহিত করা হয়। বঙ্গবন্ধু ১৯৭৩ সালে উক্ত কালো আইন বাতিল করে দেশের চারটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, যথা–ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়কে স্বায়ত্তশাসন প্রদান করেছেন। একই সাথে তিনি দক্ষ জনশক্তির জন্য সুস্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করে মেডিক্যাল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন।

উল্লেখ্য, এই স্বায়ত্তশাসন প্রদানের সময় বিভিন্ন মহল থেকে নানা ধরনের শঙ্কা উত্থাপন করা হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর সামনে, কিন্তু সেগুলোকে তিনি গ্রাহ্য না করে বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষকদের স্বায়ত্তশাসনের পথ সুগম করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে বঙ্গবন্ধু উচ্চতর গবেষণা ও মুক্তবুদ্ধি চর্চার ক্ষেত্র তৈরি করেন কারণ তিনি দেখেছেন যে, বাংলাদেশের ইতিহাসের প্রতিটি পালাবদলে অন্যতম বড় ভূমিকা পালন করেছে দেশটির বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ এবং এর শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন, ছেষট্টির ছয় দফা, উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিশ্ববিদ্যালয় ও এর শিক্ষক-শিক্ষার্থীর ভূমিকা অপরিসীম। বঙ্গবন্ধু এসব আন্দোলন-সংগ্রাম প্রত্যক্ষ করেছেন খুব কাছে থেকে, যেহেতু তিনি নিজেই এসব আন্দোলনে সরাসরি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শক্তিমত্তার জায়গাটুকু তিনি ভালোভাবেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। আর সে জন্যই তিনি নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তার সেসব উদ্যোগের কিছু ছিল তাৎক্ষণিক আর কিছু ছিল দীর্ঘমেয়াদি। বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন শুরু হতে না হতেই ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট দুর্ভাগ্যক্রমে স্বাধীনতাবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল ষড়যন্ত্রকারীদের হাতে তিনি নির্মমভাবে নিহত হন। ফলে বঙ্গবন্ধুর সময়োপযোগী সুদূরপ্রসারী শিক্ষা ভাবনা ও পরিকল্পনা আর বাস্তবায়ন হয়নি। তবে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর ২০০৯ খ্রি. বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা রাষ্ট্রক্ষমতায় এসে বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা ভাবনাকে পুনরায় কার্যকরের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। দেশরত্ন শেখ হাসিনার ২০১০ খ্রি. শিক্ষানীতির মধ্যে বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা ভাবনার ব্যাপক প্রতিফলন ঘটেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতির পিতার স্বপ্নের 'সোনার দেশ' বিনির্মাণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ভিশন ২০২১, ভিশন ২০৪১ এবং সর্বশেষ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ ঘোষণা করেছেন এবং প্রত্যেকটি ভিশন সফলভাবে বাস্তবায়নে শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা ভাবনা জাতিকে পথ দেখাবে বলে মনে করি।

সমাজের সামগ্রিক উন্নয়নে শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই–এ সত্যটি বঙ্গবন্ধু যথার্থই অনুধাবন করতে পেরেছিলেন এবং এ জন্য বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ক্ষেত্রে বিনিয়োগকে সর্বোচ্চ বিনিয়োগ হিসেবে অভিহিত করেছিলেন। তাইতো তিনি শিক্ষা খাতে জাতীয় আয়ের ৭% বরাদ্দের তাগিদ দিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন, দেশের অধিক জনসংখ্যা একটি বোঝা যা কেবল শিক্ষার মাধ্যমেই দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত হতে পারে। আর যারা এই দক্ষ মানুষ গড়ার কারিগর অর্থাৎ শিক্ষকবৃন্দ তাদের মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির কথা তিনি তার ভাষণে প্রায়ই বলতেন। বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় চতুর্থ শিল্প বিপ্লবকে মাথায় রেখে ঝউএ-৪-এর লক্ষ্য অর্জনের জন্য বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা ভাবনা বাস্তবায়ন বর্তমান বাংলাদেশে বড় বেশি প্রাসঙ্গিক। বঙ্গবন্ধুর যোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ইতোমধ্যে পদক্ষেপ নিয়েছেন। আশা করি বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা ভাবনা পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন হবে। দেশে দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে উঠবে এবং বঙ্গবন্ধুর ভাবনা অনুযায়ী মানুষ গড়ার কারিগর অর্থাৎ শিক্ষকদের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে পাশাপাশি শিক্ষকতা পেশাও আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে।

তথ্য নির্দেশিকা

১. শেখ মুজিবুর রহমান, অসমাপ্ত আত্মজীবনী, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ২০১২খ্রি.।
২. মিজানুর রহমান মিজান সম্পাদিত 'বঙ্গবন্ধুর ভাষণ', হাওলাদার প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ ২০২১ খ্রি.।
৩. প্রফেসর ড. আব্দুল খালেক, বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা ও মানবসম্পদ ভাবনার গতিপ্রকৃতি, https://www.varsitynews24.com
৪. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ, বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা-দর্শন ও বাস্তবতা, প্রকাশ : ১৭ মার্চ ২০ https://samakal.com
৫. ড. গোলাম কবীর, শিক্ষার ইতিহাস : বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা ভাবনা, সম্পাদক, বাংলাদেশের শিক্ষা https://bn.bdeduarticle.com
৬. মো. সিদ্দিকুর রহমান, শিক্ষায় বঙ্গবন্ধুর অবদান, ২১ মার্চ ২০২০, https://www.jugantor.com.
৭. মোঃ নাসির উদ্দিন মিতুল, বঙ্গবন্ধুর গ্রন্থাগার ভাবনা, https://opinion.bdnews24.com
৮. কুদরাত-ই খুদা শিক্ষা কমিশন, ১৯৭২।

লেখক : বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা), সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ), মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর বাংলাদেশ, ঢাকা

ঘুরতে ঘুরতে টুঙ্গিপাড়ায়

মাসরুর-উর-রহমান আবীর

সরকারি চাকরিতে যোগদানের আগে চাকরি করতাম এসিড সারভাইভার্স ফাউন্ডেশন হসপিটালে।

বাংলাদেশের অনেক মানুষ এসিড সন্ত্রাসের শিকার হন। নারীরা হন, পুরুষরাও হন। তবে পুরুষের তুলনায় আক্রান্ত নারীর সংখ্যা অনেক বেশি। প্রত্যাখ্যাত হয়ে যেমন নারীর দিকে এসিড ছুড়ে মারা হয়, তেমনি জমিজমা নিয়ে বিবাদেও এসিডে আক্রান্ত হন অনেকেই। এই আক্রান্ত মানুষদেরই চিকিৎসা দেওয়া হতো এ হাসপাতালে।

তবে এসিড সারভাইভার্স ফাউন্ডেশনে শুধু চিকিৎসাই দেওয়া হতো না, ভিকটিমকে আইনগত সহায়তাও দেওয়া হতো। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী রোগীর জখমের বিস্তারিত বর্ণনা উল্লেখ করে আমরা মেডিক্যাল সার্টিফিকেট দিতাম। আইনগত প্রক্রিয়ার কোনো একপর্যায়ে আদালত থেকে ডাক আসত। তখন বিভিন্ন জেলার আদালতে উপস্থিত হয়ে মেডিক্যাল সার্টিফিকেটের সপক্ষে ব্যাখ্যা দিতে হতো, আর দুই পক্ষের আইনজীবীর জেরার সম্মুখীন হয়ে রোগীর জখমের প্রকৃতি আর এর সম্ভাব্য কারণ নিয়ে নানা রকম প্রশ্নের উত্তর দিতে হতো। এই আদালতে সাক্ষ্য দেওয়ার ভয়েই অনেকে এখানে চাকরি করতে চাইতেন না। আর আমার এখানে চাকরি করার অন্যতম উদ্দেশ্যই ছিল সাক্ষ্য দেওয়ার সুবাদে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় নির্বিবাদে ঘুরে বেড়ানো। সাক্ষ্য দিতে যাওয়ার জন্য এএসএফ থেকে গাড়ি দেওয়া হতো আর থাকা-খাওয়ার জন্য হোটেলের ব্যবস্থাও করা হতো। আমি তাই ওখানে চাকরিকালীন সময়ে কাজের সুবাদেই মহানন্দে ঘুরে এসেছি বগুড়া, গাইবান্ধা, ভোলা, নরসিংদী, আরো কত জায়গায়!

সরকারি চাকরি শুরু করার পরও হঠাৎ হঠাৎ ডাক পড়ে, অনেক পুরনো কোনো মেডিক্যাল সার্টিফিকেটের সপক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য। সরকারি ব্যবস্থাপনার দীর্ঘসূত্রতা আর আরো বিভিন্ন কারণে এমন অস্বাভাবিক বিলম্ব হয়। হয়তো আমার সাক্ষ্যের অভাবেই আটকে আছে মামলার কার্যক্রম আর একজন মানুষের সুবিচার। আমি তাই কর্মস্থল ত্যাগের অনুমতি নিয়ে ঝালকাঠি থেকে চলে যাই জামালপুর, কিংবা নিটোর থেকে চলে যাই রাজশাহী।

২০১৫-র কোনো এক সকালে তেমনই এক সমন হাতে পেলাম। এসেছে সাতক্ষীরার জেলা ও দায়রা জজ আদালত থেকে। পাঁচ বছর আগে দেওয়া মেডিক্যাল সার্টিফিকেটের পক্ষে সাক্ষ্য দিতে যেতে হবে সাতক্ষীরায়। আমার কোনো আপত্তি নেই। পরিচালকের অনুমতি নিয়ে ঝটপট রেডি হয়ে যাই। সাক্ষ্যের নির্দিষ্ট তারিখের আগের দিন অফিস শেষে দুপুরবেলা রওনা দিই সাতক্ষীরার দিকে। বেশ রাতে সাতক্ষীরা পৌঁছে হোটেলে ঢুকে খেয়েদেয়ে ঘুম।

পরদিন ঘুম ভাঙে খুব ভোরে। হালকা ঠাণ্ডা বাতাসের মাঝেই চলে যাই বাজারে। মাছের বাজারে প্রচণ্ড ভিড়। চারদিকে ফিশ ক্রেট নামের প্লাস্টিকের ঝুড়ি ভর্তি নানা রকম মাছ। এই এলাকার বিখ্যাত বাগদা আর গলদা চিংড়ি তো আছেই, সাথে আরো আছে ভেটকি, পারশে, ট্যাংরা, রুই, আরো কত মাছ! বিক্রেতাদের হাঁকডাক আর ক্রেতাদের দামাদামিতে চারদিক গমগম করছে। পাইকারি দরে বিক্রি হচ্ছে তাজা সব মাছ। দরদামের ফয়সালা হওয়ার সাথে সাথেই আস্ত ক্রেটগুলো একপাশে সরিয়ে প্যাকিং করা শুরু হচ্ছে।

আমি ঘুরে ঘুরে লোকে লোকারণ্য মাছের বাজার দেখি। কিনেও ফেলি খানিকটা বাগদা চিংড়ি। আর আগ্রহ পাই পারশে বা ফাইসা মাছ দেখে। এই জিনিস তো ঢাকায় পাওয়া যাবে না। আর দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের পারশে মাছের চমৎকার স্বাদ একবার যে পেয়েছে, তাকে এই স্বাদ আবার নিতেই হবে। আমি তাই বিখ্যাত পারশে মাছও কিনে ফেলি বেশ খানিকটা। আর একটা বড়সড় ভেটকি মাছ। ক্রেটসহ মাছ প্যাকিং করে হোটেলে পৌঁছে ফিটফাট রেডি হয়ে যাই সফরের আসল উদ্দেশ্য সাধনে।

সকাল ১০টার দিকে পৌঁছি আদালতে। এ এক অন্য রকম বিচিত্র জগৎ! যিনি কখনো আদালত প্রাঙ্গণে হাজির হননি, এজলাসে বসে মামলা আর জেরার গতিপ্রকৃতি দেখেননি, তার পক্ষে প্রথমবার গিয়ে পুরো ব্যাপারটা ঠিকভাবে অনুসরণ করাও বেশ দুরূহ হতে পারে।

আমি সব সময় বসে বসে খুব ঔৎসুক্যের সাথে চারপাশের কর্মকাণ্ড দেখি। যেহেতু অনেক দূর থেকে যাই, তাই আসামিদের নিয়মিত হাজিরা শেষ হলেই সাধারণত প্রথম মামলা হিসেবে আমারটা তোলা হয়। এরপর আমার ডাক পড়ে কাঠগড়ায়। শপথ পাঠ শেষে মাননীয় জজ সাহেবের নির্দেশ অনুযায়ী মেডিক্যাল সার্টিফিকেটের সারসংক্ষেপ বুঝিয়ে বলতে হয়। সরকারপক্ষের পাবলিক প্রসিকিউটর কিছু মামুলি প্রশ্ন করেন। এর পরই শুরু হয় আসামিপক্ষের আইনজীবীর কড়া সওয়াল-জবাব। চোখা চোখা প্রশ্নবাণ ছুটে আসতে থাকে, আর ঠাণ্ডা মাথায় নৈপুণ্যের সাথে তার মোকাবিলা করতে হয়। 'আপনি টাকা খেয়ে সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মিথ্যা বানোয়াট সার্টিফিকেট দিয়েছেন' শুনে প্রথম দিকে ঝট করে মাথা গরম হয়ে যেত, তবে এখন আমি স্মিত হেসে বলতে শিখেছি 'এটা ঠিক না।' আমাকে শেখানো হয়েছিল এ রকম ক্ষেত্রে 'ইহা সত্য নহে' বলতে হবে, তবে নিখাদ সাধু ভাষায় অতটা সিনেমাটিক ডায়লগ না দিয়ে আমি বরাবরই চলিত ভাষায় উত্তর দিই।

তবে প্রায়ই মজা হয় সব কাজের শেষে। কাঠগড়া থেকে নেমে আসার পরে কঠিন আক্রমণ করা সেই উকিল সাহেব এগিয়ে আসেন। হাতে হাত মিলিয়ে হাসিমুখে বলেন, 'কিছু মনে করবেন না, ডাক্তার সাহেব; পেশার স্বার্থে ও রকম করতে হয়।' অনেক সময়ই মাননীয় বিচারক মহোদয় আমন্ত্রণ জানান তার খাসকামরায়। আদালতকক্ষের ঠিক পেছনে বিশাল সে রুমে বসে কৃত্রিমতার খোলস খুলে রেখে আন্তরিকভাবে গল্প করেন, চা খাওয়ান, আবার কখনো নিজের ছোটখাটো শারীরিক অসুবিধার উপশম জেনে নেন। ভোলার জেলা আদালতে এত বেশিবার যেতে হয়েছিল যে জজ সাহেব পরে আমার ফোন নম্বর রেখে দিয়েছিলেন, আর নতুন কোনো সমন পাঠানোর আগে আমাকে ফোন করে জেনে নিতেন কোন তারিখের জন্য সমন পাঠানো হলে আমার সুবিধা হয়।

সাতক্ষীরা আদালতের কাজকর্ম বেশ মসৃণভাবেই শেষ হলো। এরপর আর বেশি দেরি করি না। হোটেল ছেড়ে দিয়ে মাছের ক্রেট নিয়ে রওনা দিই ঢাকার দিকে। কিছুক্ষণ পরই দুপুর হয়ে যায়। কোথাও থেমে খাওয়া দরকার। কোথায় থামা যায়? তখনই মনে পড়ে আব্বাস হোটেলের কথা।

খুলনা জেলার এক উপজেলা ডুমুরিয়া। সাতক্ষীরা ও যশোর জেলার কোল ঘেঁষে খুলনার এই উপজেলা দিয়েই চলে গেছে মহাসড়ক। আর তার পাশেই ছোট্ট এক এলাকার নাম চুকনগর। ১৯৭১ সালে এক দিনে ১০ হাজার মানুষকে হত্যা করার মতো মর্মান্তিক গণহত্যা হয়েছে এই চুকনগরে। আর এই চুকনগরেই আছে চুইঝালে খাসির মাংস খাওয়ার সুবিখ্যাত রেস্তোরাঁ আব্বাস হোটেল।

চুইঝাল একরকম লতাজাতীয় গাছ। এটা পাওয়া যায় শুধু খুলনা, যশোর, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট এলাকায়। এই গাছের কাণ্ড, শাখা, এমনকি শিকড়ও মসলা হিসেবে মাংস রান্নার সময় দেওয়া হয়, আর তাতে ঝাঁজ আর ঝাল বেড়ে গিয়ে খাবার হয় আরো উপাদেয় আর লোভনীয়। আর খুলনার ঐতিহ্যবাহী কায়দায় চুইঝালে মাংস রান্নার সময় অনেকগুলো আস্ত রসুন দেওয়ার কারণে স্বাদ যেমন বাড়ে, তেমনি দৃষ্টির সুখও বাড়ে অনেকখানি।

আমরা পথের পাশে মেসার্স আব্বাস হোটেলে থামি। স্থানীয় বাসিন্দা আব্বাস আলী মোড়ল প্রায় ৭০ বছর আগে ভারতের মাদ্রাজ থেকে রান্না শিখে নিজের এলাকায় ফেরেন। এরপর নিজস্ব কিছু কৌশল মিশিয়ে রেস্টুরেন্ট ব্যবসা শুরু করেন। তার রান্না করা সব খাবারই প্রশংসা পেলেও সবচেয়ে বিখ্যাত হয়ে যায় স্থানীয় চুইঝাল দিয়ে রান্না করা খাসির মাংস। তার মৃত্যুর পরে তিন ছেলে রান্না আর ব্যবসার হাল ধরেন, আর এখন রেস্টুরেন্ট চালাচ্ছেন তাদের পরের প্রজন্ম।

টিনের চাল দেওয়া একতলা দালান। টাইলস দিয়ে ঢাকা দেয়াল আর পুরনো আমলের মোজাইকে ঢাকা মেঝে। কিন্তু সাধারণ চেহারার এই রেস্তোরাঁর সামনেই পার্ক করা গাড়ির সারি। এই ভরদুপুরে ভেতরটাও দারুণ কর্মব্যস্ত। ফাঁকা একটা টেবিলে বসে জানলাম, এখানে শুধু সাদা ভাত আর চুইঝালে খাসির মাংস পাওয়া যায়, আর কিছু না। অর্ডার দিয়ে হাত ধুয়ে বসি।

গরম ভাতের প্লেট দিয়ে যাওয়ার একটু পরই ছোটখাটো বাটি না এসে স্টিলের বিরাট বড় গামলা এসে আমার টেবিলে হাজির হয়। গামলার ভেতরে কৃষ্ণবর্ণ কষা ঝোলের মাঝে কালচে লাল বড় বড় খাসির মাংসের টুকরো, আর তার ফাঁকে ফাঁকে আস্ত রসুন আর এক-দেড় ইঞ্চি করে কাটা চুইয়ের আঁটি। পছন্দমতো যেকোনো পিস মাংস তুলে নেওয়া যায় পাতে, একটা কিংবা যতগুলো খুশি। তেল নুন মসলায় সুষমভাবে মাখা মাংসের ঝোল গরম ভাতের ওপরে ছড়িয়ে দিলেই একটা মৃদু সুঘ্রাণ ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। খাসির মাংসও সঠিক মাত্রায় রান্না করা, একটু টানতেই আস্তে খুলে আসে। খাসির মাংস আর ঝোলসহ ভাত মুখে দেওয়ার পরে চুইয়ের নরম ঝাল ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করে পুরো মুখবিবরকে। এমন গুরুপাক লোভনীয় খানাদানা এক পিস মাংস দিয়ে শেষ করা রীতিমতো অন্যায়। আর আমি বরাবরই অন্যায়কে তীব্রভাবে ঘৃণা করি।

চুকনগর থেকে রওনা দিয়ে হঠাৎ মনে হয়, এখন সরাসরি ঢাকায় ফিরব না। আগে যাব টুঙ্গিপাড়ায়।

তখনকার ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার টুঙ্গিপাড়া গ্রামের শেখ বংশে ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ জন্মগ্রহণ করেন শেখ মুজিবুর রহমান। তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত এই টুঙ্গিপাড়ার ইংরেজি স্কুলেই তিনি পড়তেন। চতুর্থ শ্রেণিতে উঠে তিনি গোপালগঞ্জে চলে যান আর বাবার সাথে সেখানেই থাকতে শুরু করেন। তবু সারাজীবন ধরে আমৃত্যু তিনি ফিরে ফিরে এসেছেন প্রিয় টুঙ্গিপাড়ায়।

এখনকার গোপালগঞ্জ জেলার একটা উপজেলা এই টুঙ্গিপাড়া।

গাছগাছালির ভিড় পেরিয়ে একসময় পৌঁছি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিসৌধে। দুপাশে ফুলের বাগানের মাঝ দিয়ে এগিয়ে গেলে সামনে পড়ে সমাধিসৌধ।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধি

লাল সিরামিক ইট আর সাদা-কালো মার্বেল পাথরের কাজ চারদিকে। গোল গম্বুজবিশিষ্ট সৌধের ভেতরে তিনটা কবর। বঙ্গবন্ধুর আর তার মা-বাবার।

১৯৯৬ সালে প্রথম এই সমাধিসৌধ কমপ্লেক্স তৈরির পরিকল্পনা করা হয়। ১৯৯৯ সালে রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন আর ২০০১ সালের ১০ই জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই সমাধিসৌধের উদ্বোধন করেন।

ধীর পদক্ষেপে সমাধিসৌধের ভেতরে ঢুকি। ওপরের জাফরি কাটা দেয়ালের ভেতর দিয়ে বাইরের আলো ঢুকে ভেতরে আলোছায়ার অদ্ভুত খেলা। এক পাশে মার্বেল পাথরেরই ছাউনি দেওয়া তার বাবা আর মায়ের কবর, আর অন্য পাশে বঙ্গবন্ধুর কবর। চারদিকে কালো আর মাঝখানে সাদা মার্বেল পাথর দিয়ে বাঁধানো। ওখানে বাতাসও কেমন শান্ত আর স্থির। প্রবল শ্রদ্ধা আর সম্মানে অজান্তেই মাথা নত হয়ে আসে।

এই কমপ্লেক্সে ভেতরেই পাঠাগার আর জাদুঘর আছে। আর আছে প্রদর্শনী কেন্দ্র। ভেতরে বঙ্গবন্ধুর জীবনের নানা পর্যায়ের অজস্র আলোক-চিত্র সাজানো। এ ছাড়া বিভিন্ন শিল্পীর আঁকা শিল্পকর্ম আর দেশ-বিদেশ থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্র। হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ প্রায় হোঁচট খেয়ে থমকে দাঁড়াই। আমার সামনে কাচে ঘেরা বড় এক বাক্সে ভেতরে রাখা একটা কাঠের তৈরি কফিন।

মন চলে যায় সুদূর অতীতে। দিব্যচোখে দেখতে পাই ১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্টের ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরের বাড়িটা। সাদা পাঞ্জাবি আর সাদা চেক লুঙ্গি পরা বঙ্গবন্ধু স্থির শুয়ে আছেন সিঁড়ির ওপরে। পা দুটো হালকা ভাঁজ হয়ে আছে। পাঞ্জাবির বুকের কাছটা রক্তে লাল। মাথার পাশে ভেঙে পড়ে আছে কালো মোটা ফ্রেমের চশমা। দৃপ্ত সে কণ্ঠস্বর তখন চিরদিনের জন্য স্তব্ধ। পুরো জাতিকে নির্দেশনা দেওয়া ঋজু সে তর্জনী তখন ন্যুব্জ।

১৬ই আগস্ট দুপুর ১টার দিকে সামরিক হেলিকপ্টারে করে তার মৃতদেহ টুঙ্গিপাড়ায় নেওয়া হয়। এই কফিনে করেই বহন করা হয় তার গুলিবিদ্ধ মৃতদেহ।

বঙ্গবন্ধুর মৃতদেহ বহন করা কফিন

হেলিপ্যাড থেকে বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে নেওয়ার পরে কাঠমিস্ত্রি ডেকে খোলা হয় কফিন। ব্লেড দিয়ে গায়ের পোশাক কেটে দোকান থেকে কিনে আনা ৫৭০ সাবান দিয়ে বিদায়ি গোসল করানো হয়। পাশের রেড ক্রস হাসপাতাল থেকে দুটো ত্রাণের সাদা শাড়ি এনে লাল-কালো পাড় টান দিয়ে ছিঁড়ে ফেলে সে সাদা শাড়ির কাপড়ই পরানো হয় কাফন হিসেবে। এরপর পারিবারিক কবরস্থানে তার বাবা আর মায়ের কবরের পাশেই দাফন করা হয় তাকে। দাফন আর জানাজায় অংশ নিতে পারেন গ্রামের অল্প কয়েকজন মানুষ।

মানুষের জীবন কী অকিঞ্চিৎকর! কী অদ্ভুত রকমের অনিশ্চয়তায় মোড়ানো! দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তানের জীবনেরও কী নিদারুণ পরিসমাপ্তি!

আমি বিষণ্ন বিকেলে মাথা নিচু করে বিষণ্ন মনে বের হই।

লেখক : বিসিএস (স্বাস্থ্য), সহকারী অধ্যাপক (প্লাস্টিক সার্জারি), শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট, ঢাকা

Reification of Economy and Society, Climate Change and Covid-19: SDGs as Adaptation

Abu Saleh Mohammad Noman

Abstract

The only matter that distinguished human beings from other animals and placed them on the state of supremacy over others is their labour power which is unlimited and by which they produce their means of subsistence or material life as food, shelter and clothing and make social world or super organic society from animal world or inorganic society. But, for reification or prioritizing economic activities and profit maximization over human beings, in capitalistic society human labour power is used excessively to fulfill the appetite of unlimited economic interest of bourgeoisie and human beings are acting as the prime agent of ecological destruction that leads to different climatic changes which cause increasing frequency of various natural and manmade disasters that affect their lives and livelihoods in an unwanted fashion. Novel corona virus or Covid-19 is the latest version of manmade disaster which has already become epidemic in almost all countries of the world. Using their labour power human beings have already explored some vaccines or medicines to curve the reign of its destructive invasion but medicine or vaccine is not the ultimate solution to it as this pandemic is the dress rehearsal of upcoming more destructive collapse of civilization within decade if the reification, the root cause of all existing and upcoming epidemics, is not addressed properly and sincerely just now. Achieving Sustainable Development Goals (SDGs) must be the strategy of adaptation to it and only human natural and unlimited labour power can help the world to achieve SDGs. Only then, the survivability of human beings on earth in safe and sound may be ensured.

Human Labour Power and Mode of production

In this globe, no animals except human beings produce their means of subsistence (Marx and Engels, 1845-1848). These animals extract their subsistence directly from nature and human beings could follow the same process at ancient society's primary stage that is identified as the commencement of 'savagery', 'hunting and gathering society' and 'simple society' stratified by L. H. Morgan (1877), Lenski (1966), and Herbert Spencer (1860/2020) respectively. For the absence of (creative) mode of production, distinguishes human beings from other animal, many sociologists addressed the human beings of this stage as members of animal world or inorganic and Organic society, not the members of social world or super organic society or civilized society (Spencer, 1860/2020, Lenski, 1966); they did not reach the state of supremacy over other animals. Only the matter that distinguished human beings from other animals is their labour power, creativity or production power which is unlimited and by which human beings produce their means of subsistence or create utility. Others do not have this labour/production power or creativity, they have only labour that does not create any mode of production.

Society and Human Speaking and Labour Power

To survive in this world, human beings need not only food and shelter like other animals; they also need cloth unlike other animals. This need of clothing also played vital role to differentiate them from other animals and placed them on the state of supremacy over others (Marx and Engels, 1845-1848). Besides, only human beings have speaking or interaction power where their face or body languages are important and based on this interaction with one another and their labour power, human beings make society and economic categories stem from human labour are produced by human beings (Marx, 1859/1977; Morrison, 1995). Other animals do not have speaking power. That is why they cannot make society, they have no economic activities and they are not social beings.

Ecosystem, Modes of Production and Social Change

Unlike other animals to survive in this globe human beings must produce the means or commodities that fulfill their fundamental needs of food, shelter and clothing. By producing their means of subsistence they basically produce their material life (Marx and Engels, (1845-1848). But, to fulfill these needs, what they produce and how they produce depends on where they live and what they find in climate, nature, environment or ecosystem (Marx, 1859/1977; Morrison, 1995). By the change of their means and force of production, their relations of production change which results in the change of mode of production or social change. According to Marx, by the course of time and following the rules of dialectical materialism, human beings passed different modes of production or societies successively as primitive communism, slave, feudalistic and capitalistic modes of production or societies (Marx, 1859/1977; Morrison 1995).

Labour Power, Capitalism and Commodity Fetishism

Commodities produced by the labour power of human beings have only use value: the ability of a commodity to render a particular service to an individual, to fill only one particular need or function and to serve directly as a means of existence. 'Not one atom' of exchange value lies in the commodity but lies in the social framework of capitalistic society and here this exchange value dominates over use so highly that people are made to believe that value is a substance inherent in commodities and there is an extraordinary power in commodities to ascertain its value (False belief) which is termed as 'fetishism of commodities'. Commodities of human beings conceal the social nature of their private labours and thus the relations between individuals appear as relations between material objects.

Reification of Economy and Society, Abuse of Labour Power and Climate Change

Commodities in capitalistic mode of production appear to have a life (personified) of their own and one commodity enters into social relations with another, as such appear to have human qualities. While human beings create society based on their labour power and other distinguished characteristics, reification in society of capitalism reverses this system by making it appear as if society or economic system makes human beings (Marx, 1867/1976). For profit maximization economic activities in the early and mid 19th century are so prioritized that human labour power is used and abused excessively and it is hypothesized in the First Earth Summit in 1992 that human beings through their labour power activities are acting as the prime agent of rapidly destroying the ecosystem or equilibrium of the Earth and leading to different climatic changes, "a change of climate which is attributed directly or indirectly to human activity that alters the composition of the global atmosphere and which is in addition to natural climate variability observed over comparable time periods" (UNFCCC 1992; Islam, Z. Shafie, H. and Mahmood, R. 2017).

As time passes, this trend has reached a rather alarming stage as the accelerating pace of human labour power, both industrial and agricultural has caused, among other things, an increasing accumulation of polyatomic molecules which cause global warming and increasing frequency of various natural disasters that affect their lives and livelihoods in an unwanted fashion as well (Choudhury, 2009/2012). The New York Times presented a report of WMO, NASA and NOAA on January 15 2020 where it is affirmed that 2019 was the second warmest year ever. The average temperature for 2019 was only a small fraction of a degree lower than in the warmest year 2016, a year with a strong El Nino, when changes in the ocean and air in the equatorial Pacific Ocean led to shifting weather patterns worldwide and pumped a lot of heat from the Pacific into the atmosphere. The 2010s were the hottest decade on record on the planet. Since the 1960s, each decade has been warmer than the previous one by significant amounts. While the 2010s continued this trend, the second half of the decade was especially warmer. Deke Arndt, chief of the monitoring branch of the National Centers for Environmental Information (NCEI) of the USA said that human beings have entered a new neighborhood in the last five years. Cavin A. Schmidt, director of the Goddard Institute for Space Studies argued that these trends are the footprints of abuse of human labour power stomping on the atmosphere. Islam Zahidul and Shafie, Hasan (2017) explored that as the reification of economy and society or climate change the world encounters increased frequency of various natural and man-made disasters as droughts, floods, river and coastal erosion, cyclones and tidal surge, the thunder storm, water logging, arsenic contamination, salinity intrusion, tornadoes, cold waves, earthquakes, landslides, hailstorm etc.

Climate Change and Covid-19

Novel corona virus or Covid-19 is the latest version of manmade disaster and which, according to WHO, has already become epidemic in almost all countries of the world irrespective of developed, undeveloped or underdeveloped. Jem Bendell (2020), a social science professor of the University of Cumbria and well-known among environmentalists for his "Theory of Deep Adaptation" found climate mayhem lurking behind covid-19 outbreak. To Bendell, the first effects of climate change are disastrous factors of the wildfires in Australia and California, African hurricanes, South Asian typhoons and harvest collapses in the Middle East that can disrupt wildlife migration to human societies and the second effects of climate change are the consequent pandemics of diseases like coronavirus. His thought is supported by Arron Bernstein of Harvard University's T. H. Chan School of Public Health as Bernstein said, though there is no direct evidence relating global warming with Covid-19, wildlife is moving to cooler areas. So, human beings become in closer contact with them and the diseases they carry as epidemiologists found the coronavirus originated in bats. The same speech is echoed in the tongue of Thomas Gillespie, a renowned ecologist and associate professor of environmental sciences department of Emory University as he (2020) argued, "Pathogens do not respect species boundaries. I am not at all surprised about the coronavirus outbreak. The majority of pathogens are still to be discovered. We are at the very tip of the iceberg. Human beings are creating the condition for the pandemic of the diseases by reducing the natural barriers between host animals – in which the virus is naturally circulating – and themselves". Gillespie explains that, wildlife everywhere is being put under a lot of stress. Major landscape changes by reification of economy and society as logging, mining, road building, massive urbanization and industrialization are causing animals to lose their habitats. As a result, species become crowded together and come into closer contact with humans. Endangered species are now moving and mixing with various animals as well as human beings. Disease ecologists argue that viruses, bacterias and other pathogens are also likely to transmit from animals to humans in the various informal markets like "wet market" in Wuhan which is thought by Chinese government to be the starting point of the current Covid-19. These informal markets have sprung up to provide fresh meat to fast-growing urban populations around the world. Here animals are slaughtered, cut up and sold on the spot.

Exponential Growth of Climate Change and Corona Virus

Howard Kunreuther and Paul Slovic (2020) showed that, the curve of coronavirus pandemic sadly grows exponentially – at an increasing rate over time- like the global climate change curve. Carbon emissions, their concentration in the atmosphere and their consequent effects are growing exponentially right now. Almost 24 months passed since the first corona infected person was detected in Wuhan, China. According to worldometers statistics of November 16, 2021, within this time more than 5.11 million people have already died, more than 254 million people infected by Covid-19 in the world.

Human beings had been trying relentlessly heart and soul using their labour power to invent vaccines or medicines to curve the reign of the invasion of novel corona. They have already explored some vaccines. Live Science (2021) reports that as the world races to vaccinate people as fast as possible the coronavirus is mutating, picking up genetic changes. According to Indian Times, Indian National Task Force for Covid-19 (2021) informed that the genetic diagnostic laboratories in India have detected over 24,000 mutations in 7,000 variants of the novel coronavirus in the last one year. So, the untamed and redoubtable impact of Covid-19 on lives and livelihoods of human beings is going on.

Covid-19 and Its Socio-cultural Impacts

Jem Bendell (2020) explained that the lockdown, social distancing and using face mask caused by the coronavirus pandemic all over the world are providing human beings with a taste of the disruptions to their direct social interactions with one another in daily life and creating imbalances in human social relations and social structures or society. It causes not only massive death tolls but also short, mid and long term socio-economic, political and cultural impacts all over the world, which have already reported by different research institutions. This crisis reveals how fragile our current way of life has become.

Covid-19 as a Dress Rehearsal of Human Civilization Collapse

However, medicine or vaccine is not the ultimate solution to it as Steven Desmyter, co-head of responsible investment at Man Group, explains the reason behind it in this way, with global warming, there will be catastrophes of equal or bigger magnitude than Covid-19. Saijel Kishan (2020) in his article published in Bloomberg.com emphasized that, policy makers and business leaders have to recognize that climate change will cause even more destructive and disruptive disasters than the coronavirus. Financial companies could face a 'climate Minsky moment' or a sudden collapse of values, if they didn't address climate change. Economists at JP Morgan Chase & Co. warned that the most risks of climate change including the collapse of human civilization can't be ruled out. Consulting firm McKinsey & Co. viewed that, intensifying climate vulnerability could put millions of lives and trillions of dollars at risk. Jem Bendell (2020) addressed this pandemic as dress rehearsal of upcoming more destructive collapse of civilization within decade for making economy and society pivotal over human beings to fulfill the appetite of unlimited economic interest of bourgeoisie.

Solution within Human Labour Power and Achieving SDGs as Adaptation

So, human beings have to address the root cause of all such types of epidemics – existing and upcoming, being sincere to preserve the nature by reducing the emissions of Green House Gases (GHGs), ensuring zero population growth and preserving the bio-diversity which was addressed before four decades in Brundtland Report of 1978 titled 'Our Common Future' and other successive sustainable development related summits, policies, protocols, programs and action plans. Here the crying need is changes in behavior and/or belief in response to improve the conditions of existence, including a culturally meaningful life. It is theorized that adaptation in human being has a greater number of attendant features for adaptive ability including very complex human cognition, social organization, values and meaning (Islam, Z. Shafie, H. and Mahmood, R. 2017). Sustainable Development Goals (SDGs), a collection of 17 global goals set by the United Nations General Assembly in 2015 which are aimed to be achieved by 2030, must be the strategy of adaptation to climate change induced calamities that endangered human survivability in this world. Each goal's targets measured with indicators should be executed seriously and sincerely so that the basic needs of the present generations can be met without compromising with the meet of basic needs of future generations giving the equal importance on economic, social and ecological aspects of sustainable development. Specially, the SDGs number 1, 4, 8, 9, 10, 11, 12 and 13 as No Poverty, Quality Education, Decent Work and Economic Growth; Industry, Innovation and Infrastructure, Reducing Inequality, Sustainable Cities and Communities, Responsible Consumption and production and Climate Action respectively should be given the priority in execution. In this aspect, it is high time to use human natural and unlimited labour power in inventing various adaptive technologies to climate change, which will play vital role in achieving SDGs, conserving nature from pollution and ensuring the survivability of human beings on earth in safe and sound.

Conclusion

It is expected that, the Covid-19 will shake the conscience of the people of all countries and institutions especially most developed countries (MDCs) or G7 countries including BRICS who are liable for around 90% GHG emissions or global warming by prioritizing the economic interest over the existence of human beings and have been ignoring the matter of climate change and showing insincerity to the concept of sustainability in their development plans and policies. Now, they are expected to take the matter of climate change seriously and sincerely stopping the reification of economy and society, admitting the supremacy of human beings and their labour power over all types of economic interests at least for the security of their own lives and wealth. To maximize profit, the trend of massive production and massive consumption abusing the unlimited human labour power, the distinguishing characteristics of human beings from all other animals, must be given up by bourgeoisie. In this context, all steps to produce weapons of mass destruction (WMD) which cause great damage to human-made and natural structures especially the biosphere should be stopped just now because it must be kept in mind that it is not possible to fight against air or invisible enemies as coronavirus or something like that waiting to dismiss human civilization in near future.

References

Anik,S.I. & Khan, M.A.S.A. (2012), Climate Change Adaptation Through Local knowledge in The North Eastern region of Bangladesh, Springer, Netherlands

BANGLADESH CLIMATE CHANGE STRATEGY AND ACTION PLAN 2008, Ministry of Environment and Forests, Government of the People's Republic of Bangladesh

Bendell, J. (2020), 'Professor Sees Climate Mayhem Lurking Behind Covid-19 Outbreak' published in Bloomberg.com by Saijel Kishan

Choudhury A. M. (2009/2012), PROTECTING BANGLADESH FROM NATURAL DISSERS, Academic Press and Publishers Library-appl, Dhaka, Bangladesh

Crate, S.A. (2011), Climate and Culture: Anthropology in the Era of Contemporary Climate Change, Annual Review of Anthropology, Vol. 40:175-194

Crate, S.A. and Nuttal, M (2009/2016), Anthropology and Climate Change: From Actions to Transformations, 2nd edition, Routledge, New York

Department of Disaster Management-DDM (2013), Development of Four Decade Long Climate Scenario & Trend: Temperature, Rainfall, Sunshine & Humidity, Ministry of Disaster Management and Reliefs, Dhaka

Escobar, A. (1995), Encountering Development, the making and unmaking of the Third World, Princeton University Press, p.34. Princeton

Gillespie, T. (2020), "Tip of the iceberg: is our destruction of nature responsible for Covid-19", published in The Gardian on March 27

Health.economics.indiantimes.com

Islam, Z and Shafie H (2017), Anthropology of Climate Change: Culture and Adaptation in Bangladesh, Bangladesh Climate Change Trust (BCCT), MoEF And Department of Anthropology, University of Dhaka, Dhaka

Islam, Z, Shafie, H and Mahmood, R. (2017), Culture, Adaptation and Resilience: Essays on Climate Change Regime in South Asia, Bangladesh Climate Change Trust (BCCT), MoEF And Department of Anthropology, University of Dhaka, Dhaka

Kunreuther. H. and Slovic, P. (2020), 'What the Coronavirus Curve Teaches Us about Climate Change' published in Politico.com

Lenski, G.(1966), Power and Privilege: A Theory of Social Stratification, McGraw-Hill Book Company, New York

Livescience.com, Is there a limit to how much the coronavirus can mutate?

Marx and Engels, (1845-1848), The German Ideology, PP. 7-9.

Marx, K. (1859/1977), A Contribution to the Critique of Political Economy, Progress Publishers, Moscow

Marx, K. (1867/1976), Capital: A Critique of Political Economy, Vol. 1, Penguin, Middlesex, England

Morgan, L.H. (1877), Ancient Society, Classics of Anthropology, Edited by Ashley Montagu, United States

Morrison, K (1995), Marx, 'Durkheim, Weber: Formation of Modern Social Thought', Sage Publications, London, Thousand Oaks, New Delhi

Spencer, H. (1860/2020), First Principles, 2nd edition by Williams and Norgate, London.

World Bank, Global Economic Prospects 2011, www.worldbank.org>publication>global.

www.worldometers.info/coronavirus

Writer : BCS (General Education), Assistant Professor, Department of Sociology, Eden Mohila College, Dhaka, and PhD researcher, University of Dhaka, Dhaka

মুক্তিযুদ্ধে নারী ও তাদের স্বীকৃতি

রফিকুল ইসলাম

মুক্তিযুদ্ধ যেকোনো বিচারেই বাঙালি জাতির সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ইতিহাস। বাঙালি তার আত্মোৎসর্গের শ্রেষ্ঠতম নিদর্শনের মধ্য দিয়ে পেয়েছে তার স্বাধীনতা; যে স্বাধীনতা কেবল একটি ভূখণ্ডেরই নয়, যে স্বাধীনতা সামগ্রিক অর্থে তার অবিনাশী মুক্তির চিহ্নমালা। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ তাই কেবল ৯ মাসের ঘটনাই নয়, এর সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে ২৩ বছরের পাকিস্তানি শাসনের ক্ষতবিক্ষত আখ্যান, জড়িয়ে আছে বাঙালির উদ্বেল মুক্তি-আকাঙ্ক্ষা।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ প্রকৃত অর্থেই ছিল জনযুদ্ধ। নারী-পুরুষ-নির্বিশেষে সবাই এই সর্বাত্মক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। অথচ আমাদের দেশে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে নারীর অবদানকে সেভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে বলে মনে হয় না। মুক্তিযুদ্ধের পুরো ৯ মাস জুড়ে পাকিস্তানি বাহিনী কর্তৃক নারীর ওপর চলেছে নিপীড়ন, ধর্ষণ, লাঞ্ছনা আর সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে বাছবিচারহীনভাবে। নারীরা ধর্ষিত হয়েছে, অত্যাচারিত হয়েছে কিন্তু সবচেয়ে বড় এই নারীরা দেশের ভেতরে মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দিয়েছে, অন্যদিকে রণাঙ্গনে দাঁড়িয়েও বিপুল বিক্রমে লড়েছে। তবুও আফসোসের সঙ্গে বলতে হয়, মুক্তিযুদ্ধে নারীর অবদানের সঠিক মূল্যায়ন আজও হয়নি। এ ক্ষেত্রে কেবল আমাদের মুক্তিযুদ্ধ নয়, বিশ্ব ইতিহাসের দিকে তাকালেও দেখা যাবে, যেকোনো অমানবিকতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক যুদ্ধ অথবা স্বাধীনতাযুদ্ধে নারীর অবদান কোনো অংশেই কম নয়।

একাত্তরের উত্তাল মার্চের ৭ তারিখে তৎকালীন রেসকোর্স, বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যখন ঘোষণা দিলেন, '...আর যদি একটি গুলি চলে... প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো', সেই সময়েও 'ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলা'র কাজে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন নারীরা। ফলে দেখা যাবে, ঢাকা, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, বরিশাল, ফরিদপুর, খুলনা, ঈশ্বরদী, পাবনা, সিলেট, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী, ময়মনসিংহ সহ সব জেলায় নারীসমাজের প্রতিবাদী সভা ও মিছিল হয়েছে। এ সময় তারা জেলায়, শহরে শহরে, এলাকায় এলাকায় সংগঠিত হয়ে কুচকাওয়াজ ও অস্ত্র চালনার ট্রেনিংও শুরু করে। ৯ মার্চ বাড়িতে বাড়িতে কালো পতাকা উড়তে দেখা যায়। এই কাজে নারীসমাজ ও ছাত্রসমাজ প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল। (জহিরুল ইসলাম, একাত্তরের গেরিলা, ঢাকা, প্রকাশক মিলন নাথ, ১৯৯৭)

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রথম নারী গেরিলা স্কোয়াডের নেত্রী ফোরকান বেগম তার 'স্বাধীনতাসংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে নারী' গ্রন্থে বলেন, ২৩ মার্চ আমরা স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ বাহিনীর পাকিস্তানের বুকে পাকিস্তান ডের বিপরীতে স্বাধীন বাংলাদেশ ডে পালন করি। মেয়েদের মধ্যে শামসুন্নাহার ইকু পতাকা হাতে প্যারেডের সামনে চলে, তারপর আমি, সাকী আপা, কাওসার, ঝুনুসহ অন্য মেয়েরা। আমরাই প্যারেডের নেতৃত্ব দিই। আমাদের অনুসরণ করে ছেলেদের দল।

পরে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে বহুমাত্রিকভাবে নারীরা সেই যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। মুসলমান-হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টানসহ সব ধর্মের নারীই মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। কেবল বাঙালি নয়, সর্বাত্মকভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছেন আদিবাসী নারীরাও।
যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরে সংগ্রামী যোদ্ধা মেয়েদের জন্য বাংলাদেশের তৎকালীন সংসদ সদস্য সৈয়দা সাজেদা চৌধুরীর পরিচালনায় 'গোবরা ক্যাম্প' চালু হয়েছিল। সেই ক্যাম্পে মেয়েরা অস্ত্র চালনা শিখত। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও ব্যক্তি উদ্যোগে প্রায় ৩০০ তরুণী ও কিশোরী সংগঠক গোবরা ক্যাম্পে অবস্থান করতেন। এ ছাড়া সিভিল ডিফেন্স ও নার্সিংয়ের প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো সেখানে।
[সূত্র : মুক্তিযুদ্ধে নারী, মালেকা বেগম]

তারামন বিবি বীরপ্রতীক মুক্তিযুদ্ধের সময় রাজীবপুর ট্রেনিং ক্যাম্পে রাঁধুনি হিসেবে যোগ দেন। তখন তিনি ১৪-১৫ বছরের কিশোরী। শরীরে শক্তিমত্তা ছিল অন্য রকম। কোনো ভারী কাজেও তাকে পিছপা হতে দেখা যায়নি। পুরুষ সহযোদ্ধাদের পাশাপাশি সর্বদা অগ্রকদম ফেলে এগিয়েছেন। রাজীবপুর ওয়ার ফিল্ডে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ গুপ্তচরবৃত্তির কাজ করে গেছেন। একের পর এক অ্যাসাইনমেন্টে তিনি পাকিস্তানি সেনাদের অবস্থানস্থল কোদালকাঠী ইউনিয়নে ঢুকে যেতেন। রাতের বেলা পাক সেনা শিবিরের কাছাকাছি ঢুঁ মেরে বের করে আনতেন সব হাঁড়ির খবর। তার কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতেই মুক্তিবাহিনী প্রথম পাকসেনা শিবিরে হামলা চালায়। এ ছাড়া ওই রণাঙ্গনে যুদ্ধ শুরুর আগে তারামন বিবি অসংখ্য বাঙালি পরিবারকে পাক বাহিনীর কবল থেকে নিরাপদ স্থানে আনার অ্যাসাইনমেন্টেও অংশ নেয়, পিরোজপুর জেলার 'অপারেশন স্বরূপকাঠি বাহিনীর অকুতোভয় দুই নারী মুক্তিযোদ্ধা বীথিকা বিশ্বাস এবং শিশির কনা গ্রেনেড চার্জ করে উড়িয়ে দিয়েছিলেন গানবোর্ড। নৌকা থেকে পানিতে নেমে সাঁতরে কচুরিপানার সাথে মিশে ভাসতে ভাসতে ভিড়েছিলেন লঞ্চের গায়ে। ছুড়ে মেরেছিলেন গ্রেনেড। পিরোজপুরে এক অখ্যাত গ্রামের মেয়েগুলো হয়ে উঠেছিলে একেকজন দুর্ধর্ষ গেরিলা। বীথিকা গেরিলা ও গুপ্তচরবৃত্তির ট্রেনিং দেওয়ার জন্য মেয়েদের সংগ্রহ করে আনত। শেষ পর্যন্ত প্রায় ১০০ মেয়েকে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছিল।
[সূত্র: দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৩ ডিসেম্বর ১৯৯৮]

নারীরা ক্যাম্পে ক্যাম্পে কাজ করেছেন। মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে ক্যাম্পে রান্নার কাজ করেছেন, তারা অস্ত্র শিক্ষা নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রহরী হিসেবেও কাজ করেছেন। ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসক দলে, ফিল্ড হাসপাতালে সেবিকার কাজ করেন। অনেকে ফাস্ট এইড ট্রেনিংসহ অস্ত্র চালনা ট্রেনিং ও গেরিলা ট্রেনিং নেন। আবার শত্রুদের বিষয়ে, খানসেনা ও রাজাকারদের অবস্থান সম্পর্কে মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে খবরও দিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধের সময়। বাড়িতে মুক্তিযোদ্ধাদের লুকিয়ে রাখা, অস্ত্র এগিয়ে দেওয়া অথবা যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা ও চিকিৎসা করা, তাদের জন্য ওষুধ, খাবার এবং কাপড় সংগ্রহ করা–রক্তঝরা একাত্তরে নারীদের এই সক্রিয় কর্মকাণ্ডই ছিল তাদের মুক্তিযুদ্ধ। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের তৎকালীন সভানেত্রী সুফিয়া কামাল পাকিস্তানি বাহিনীর নজরদারিতে যুদ্ধের ৯ মাস ঢাকায় তার বাড়িতেই ছিলেন। ওই অবস্থায়ও তিনি নানা কৌশলে মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করেছেন। এসব তিনি সে সময় দিনলিপিতে লিখেছেন, যা বর্তমানে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধের ৯ মাসে সারা পূর্ববঙ্গে ১৪ লাখ বাঙালি নারীকে বিভিন্নভাবে নির্যাতিত, লাঞ্ছিত ও স্বজনহারা নিঃস্বে পরিণত হতে হয়েছে। এই ১৪ লাখের মধ্যে চার লাখ মতান্তরে দুই লাখ নারী বর্বর পাকিস্তানি সেনা ও তাদের দোসর, রাজাকার এবং বিহারিগণ কর্তৃক ধর্ষণের শিকার হন। তাদের কেউ পরে নির্মমভাবে মৃত্যুবরণ করেন। [সূত্র : 'মুক্তিযুদ্ধ ও নারী' রোকাইয়া কবির ও মুজিব মেহেদী]

এখানে মুক্তিযোদ্ধাদের মায়েদের কথাও বলা দরকার। শহীদ রুমীর মা জাহানারা ইমাম বা শহীদ আজাদের মা সাফিয়া বেগমের মতো সব মা-ই মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদের অনুপ্রেরণা দিয়ে গেছেন। তাদের এই ত্যাগও ইতিহাসের অংশ। মূলত এভাবেই নারীরা বাঙালির মুক্তির সংগ্রামে অদম্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। অনেকে জীবন বাজি রেখে সশস্ত্র যুদ্ধ করেছেন। ফিরে নাও আসতে পারে জেনেও সন্তানকে যুদ্ধে যাওয়ার অনুমতি দেন। ধরা পড়লে নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও অস্ত্র পাচার করেন, অস্ত্র লুকিয়ে রাখেন, মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দান করেন। মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যেক মায়ের রূপ এক ও অভিন্ন। তারা ত্যাগী, সহনশীল ও অসীম ধৈর্যশীলা।

কিন্তু নারী মুক্তিযোদ্ধাদের স্বীকৃতি কি সেভাবে মিলেছে?

সুকুমার বিশ্বাস তার সম্পাদিত বই 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ১৯৭১/নারী প্রত্যক্ষদর্শী ও অংশগ্রহণকারীর বিবরণ'- এ সম্পাদকের কথায় লিখেছেন, 'বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের নারীর ভূমিকাকে আলাদা করে দেখার প্রয়াস শুরু হয় বিগত নব্বইয়ের দশক থেকে। এর আগ পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস আলোচনায় নারীরা ছিলেন অনুপস্থিত।'

মূলত স্বাধীনতার ২৯ বছর পর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রত্যক্ষ অবদানের স্বীকৃতি পেতে শুরু করেন নারীরা। এর ধারাবাহিকতায় দীর্ঘ বিস্মৃতি ও অবহেলা শেষে ইতিহাস এখন বদলাতে শুরু করেছে। নারী মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে বীরপ্রতীক খেতাব পেয়েছেন তিনজন–১৯৭২ সালে ক্যাপ্টেন সিতারা বেগম; এরপর তারামন বিবি ১৯৭৩ সালে ও ১৯৯৭ সালে পেয়েছেন কাঁকন বিবি। তারামন বিবি ও কাঁকন বিবি ২০১৮ সালে প্রয়াত হয়েছেন এবং দুজনই অনেককাল ছিলেন বিস্মৃতির অন্ধকারে।

'মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্র' থেকে প্রথমবারের মতো বিভিন্ন অঞ্চলের মোট ১১৩ জন নারীর নিজ অভিজ্ঞতার বিবরণ তিন খণ্ডে প্রকাশিত হয়। এ ছাড়া গবেষক আফসান চৌধরী তার 'বাংলাদেশের ১৯৭১' বইয়ের তৃতীয় খণ্ডে 'আদিবাসী ও বাংলাদেশের যুদ্ধ' অধ্যায়ে মুক্তিযুদ্ধে আদিবাসী নারীদের অংশগ্রহণের বিষয়ে লিখেছেন।

পরিশেষে, বাঙালির ইতিহাসে সর্ববৃহৎ এ মুক্তিসংগ্রামের আন্দোলনে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। তাই তাদের এই অবদানকে যথাযথভাবে সম্মান ও স্বীকৃতি দেওয়া উচিত।

লেখক : বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা), সহকারী অধ্যাপক, গাইবান্ধা সরকারি মহিলা কলেজ, গাইবান্ধা

তরুণ প্রজন্ম : আত্মনির্ভরশীলতার নতুন সম্ভাবনা

মোঃ নজরুল ইসলাম

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি জনবহুল উন্নয়নশীল দেশ। আমাদের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশই হলো তরুণসমাজ। তাদেরকে ব্যতিরেকে আমাদের দেশের অর্থনৈতিক মুক্তি সম্ভব নয়। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রশিক্ষিত তরুণসমাজের কোনো বিকল্প নেই। বিশ্বে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটেছে তিনটি ধাপে। প্রথমে কৃষিনির্ভর অর্থনৈতিক উন্নয়ন। যা ছিল মানুষের কায়িক পরিশ্রমের ওপর নির্ভরশীল। এরপর শিল্প বিপ্লব নাম দিয়ে শুরু হয় শিল্পনির্ভর অর্থনীতির যাত্রা। এখানেও রয়েছে কায়িক শ্রম ও যান্ত্রিকতার মিশেল। যা আজও চলছে। তবে উন্নত দেশগুলো এ থেকে উত্তরণের পথ খুঁজছে। বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে উন্নত দেশগুলোতে তথ্য-প্রযুক্তি বিপ্লব নাম দিয়ে শুরু হয় জ্ঞাননির্ভর অর্থনীতির যাত্রা। আজকের পৃথিবীতে যা ওয়েব বা ইন্টারনেটভিত্তিক অর্থনীতি হিসেবে সুপরিচিত। উন্নত দেশগুলো ওয়েবভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে তোলায় প্রথমে গুরুত্ব দেয় প্রশিক্ষণের। শিক্ষিত তরুণ-তরুণীদের তথ্য-প্রযুক্তিতে উন্নত প্রশিক্ষণের পাশাপাশি ইন্টারনেটভিত্তিক অর্থনীতির প্রসার ঘটছে অত্যন্ত দ্রুত।

একবিংশ শতাব্দীর এই সময়ে বলা হচ্ছে, যেসব দেশের তথ্য-প্রযুক্তি খাত বিকশিত সেসব দেশের অর্থনীতিও তত উন্নত। কাজের সুযোগও সেসব দেশে বেশি। বিশ্বায়নের এই সময়ে তথ্য-প্রযুক্তিতে যারাই বেশি অগ্রগামী তারাই উন্নয়নের ঝড় তুলছে। বর্তমান বিশ্বে তথ্য-প্রযুক্তি ছাড়া কোনো দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। আমরা যদি তথ্য-প্রযুক্তিতে অগ্রসরমাণ দেশগুলোর দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাই ওই সব দেশ তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার ও উদ্ভাবনী প্রযুক্তির প্রয়োগ করে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

আইসিটিভিত্তিক অর্থনীতিতে বাংলাদেশের বাস্তবতা

তথ্য-প্রযুক্তির অন্যতম দিকপাল বিল গেটস বলেন, 2035, there will be almost no poor countries left in the world. এ প্রসঙ্গে তিনি তিনটি বিষয়ের উল্লেখ করেন। এক. ডিজিটাল বিপ্লব; দুই. ভ্যাকসিন উদ্ভাবন এবং তিন. উন্নত বীজ উদ্ভাবন।

এ তিনটি কারণে ২০৩৫ সালের মধ্যে দারিদ্র্যমুক্ত পৃথিবী গড়ে উঠবে। এতে প্রধান ভূমিকা পালন করবে ডিজিটাল বিপ্লব। বাংলাদেশ এই ডিজিটাল বিপ্লবে শামিল হয় ২০০৯ সালে। বর্তমান সরকার ২০০৮ সালের ১২ ডিসেম্বর জাতীয় নির্বাচনের প্রাক্কালে রূপকল্প ২০২১ ঘোষণার মধ্য দিয়ে এ দেশের মানুষকে স্বপ্ন দেখায় ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের। ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর জাতীয় নির্বাচনে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের অঙ্গীকারটি জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করে। ২০০৯ সালের ৬ জানুয়ারি দায়িত্ব গ্রহণের পর বর্তমান সরকারের প্রাধিকার কর্মসূচিতে স্থান পায় ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ। শুরু হয় তথ্য-প্রযুক্তিনির্ভর অর্থনীতি গড়ে তোলার নবতর যাত্রা। ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের স্তম্ভ হলো চারটি। যেমন :

১. মানবসম্পদকে একুশ শতকের উপযোগী করে গড়ে তোলা;

২. সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য এবং অর্থপূর্ণভাবে নাগরিকদের সংযুক্ত করা;

৩. সকল নাগরিকের দ্বারপ্রান্তে সেবা পৌঁছে দেওয়া এবং

৪. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যক্তিমালিকানাধীন খাতসমূহ ও বাজার ব্যবস্থাকে আরো উৎপাদনশীল ও প্রতিযোগিতামূলক করে গড়ে তোলা।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের নানা উদ্যোগ বহির্বিশ্বে তথ্য-প্রযুক্তি খাতে আমাদের ইতিবাচক ভাবমূর্তিকে তুলে ধরেছে। ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার আমাদের জন্য অনন্য সম্মান বয়ে এনেছে। জাতিসংঘ সাউথ সাউথ অ্যাওয়ার্ড, ওয়ার্ল্ড সামিট অন ইনফরমেশন সোসাইটি অ্যাওয়ার্ড, ওয়ার্ল্ড ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সার্ভিসেস অ্যালায়েন্স অ্যাওয়ার্ড ও জাতিসংঘ সাউথ সাউথ কো-অপারেশন ভিশনারি অ্যাওয়ার্ড বাংলাদেশের ঘরে এসেছে। বাংলাদেশ সরকারের নিরলস পরিশ্রম ও কূটনৈতিক দক্ষতায় দ্বিতীয়বারের মতো আন্তর্জাতিক টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়নের কাউন্সিল সদস্যপদ লাভ করে বাংলাদেশ। এর পরও আমাদের আইসিটিভিত্তিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে অনেকটা পথ পাড়ি দিতে হবে। গড়ে তুলতে হবে দক্ষ মানবসম্পদ।

আত্মনির্ভরশীলতায় আউটসোর্সিং খাত

বর্তমানে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার গতি অতীতের যেকোনো সময়ের তুলনায় বেশি। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) এক পরিসংখ্যানে বলা হয়েছে, আগামী এক দশকের মধ্যে বিশ্বে আত্মনির্ভরশীল ব্যক্তির সংখ্যা হবে বর্তমান জনসংখ্যার ৪০ শতাংশ। ঘরে বসে আয়ের পাশাপাশি আত্মনির্ভরশীল ও আপন পেশাগত দক্ষতা প্রদর্শনের সাহায্যে টাকা আয়ের মাধ্যমে নিজের ক্যারিয়ারকে বিকশিত করা যায় আউটসোর্সিংয়ের সাহায্যে। পরিবারের সবার কাছাকাছি থাকার মাধ্যমে পারিবারিক বন্ধন আরো অটুট হয়। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত মাধ্যম হচ্ছে আউটসোর্সিং। সহজ আয়ের সেরা মাধ্যম হিসেবে এরই মধ্যে সমাদৃত হয়ে উঠেছে এটি। বহির্বিশ্বের কাজ কম্পিউটারের মনিটরে সাজিয়ে দিচ্ছে কয়েকটি মধ্যস্থতাকারী ওয়েবসাইট, যাদের বলা হচ্ছে মার্কেটপ্লেস। এ মার্কেটপ্লেসই হতে পারে আয়ের নতুন ঠিকানা। বিশ্বজুড়ে জনপ্রিয় এসব মার্কেটপ্লেসের মধ্যে রয়েছে মুক্ত পেশাজীবীদের কাজের সুযোগ। এখানে কাজ করে যে কেউ সফল হতে পারে। বিশ্বের বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের অনেক কাজই এখন বাইরের প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি দিয়ে করিয়ে নেয়। যুক্তরাষ্ট্র একাই বছরে প্রায় ৫০ হাজার কোটি ডলারের আউটসোর্সিং করছে। শুধু ইল্যান্স-ওডেস্ক মার্কেটপ্লেসে ১.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের কাজ রয়েছে। প্রয়োজনীয় যোগ্যতা থাকলে যে কেউ কাজগুলো পেতে অংশ নিতে পারে।

তরুণদের সামনে অপার সম্ভাবনা

বাংলাদেশ আউটসোর্সিংয়ের এ উৎসকে কাজে লাগিয়ে অর্থ উপার্জনকে উৎসাহিত করছে। বাংলাদেশের জন্য আউটসোর্সিংই হচ্ছে এ সময়ের সবচেয়ে টেকসই কর্মক্ষেত্র। শিক্ষিত তরুণ-তরুণীদের ওয়েবে, গ্রাফিক্স ডিজাইন, সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন, সোশ্যাল মার্কেটি, থিম ডিজাইন, প্রোগ্রামিং, ওয়েবসাইট ম্যানেজমেন্ট, লিংক বিল্ডিং, ডাটা এন্ট্রি টাইপিং, আর্টিক্যাল বা ব্লগ রাইটিং বিষয়ে প্রশিক্ষিত করেছে লার্নিং অ্যান্ড আর্নিং প্রকল্পসহ আইসিটি বিভাগের অন্য প্রকল্পগুলো।

বর্তমানে সরকারি-বেসরকারি এবং ব্যক্তি উদ্যোগে দেশে এখন প্রায় পাঁচ লক্ষাধিক তরুণ-তরুণী আউটসোর্সিংয়ের উৎস থেকে আয় করার জন্য বিভিন্ন মার্কেটপ্লেসে নিবন্ধন করেছে। এদের মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি সক্রিয় ফ্রিল্যান্সার। যারা বছরে ৫০ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি আয় করেছে। বাংলাদেশের তরুণ-তরুণীরা যে মার্কেটপ্লেসটিতে সবচেয়ে বেশি নিবন্ধন করেছে সেটি হচ্ছে ইল্যান্স-ওডেস্ক। এ মার্কেট প্লেসটিতে নিবন্ধিত ফ্রিল্যান্সারের সংখ্যা সাড়ে চার লাখ। বাংলাদেশের ফ্রিল্যান্সাররা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মার্কেটপ্লেসে আউটসোর্সিং কাজে শক্ত অবস্থান করে নেয়। ইল্যান্স-ওডেস্ক একীভূত হওয়ায় পর বিশ্বের ১৮৫টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থান সপ্তম।

তরুণরাই গড়বে দেশ

ইতিহাসের দিকে চোখ ফেরালে দেখা যায়, আমাদের সব অর্জন অদম্য তারুণ্যেরই জয়গাথা। তাদের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করা গেলে তারাই দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। নানা সৃষ্টিশীল উদ্যোগ, অর্জনে, কৃতিত্বে তারাই আমাদের জন্য নতুন আশার সঞ্চারক।

জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিলের (ইউএনএফপিএ) প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ এখন ১০ থেকে ২৪ বছর বয়সী তরুণের সংখ্যা পৌনে পাঁচ কোটি। এর সঙ্গে ২৫ থেকে ৪০ বছর বয়সী যুব জনসংখ্যাকে ধরলে বলা যায় মোট জনসংখ্যার ৩ ভাগের ২ ভাগই টগবগে তরুণ। কর্মক্ষম মানুষের এই প্রবৃদ্ধি অব্যাহত থাকবে আগামী আরো দুই দশক। চীন বিপ্লবের পরের উত্থানও ছিল অনেকটা তরুণদের রক্ত ও ঘামের ফসল। ষাটের দশকে দক্ষিণ কোরিয়াও একই রকম জনসংখ্যা সুবিধা অর্জন করেছিল। তারা একে কাজে লাগিয়ে আজ শিল্পসমৃদ্ধ দেশ। বিশ্বে তথ্য-প্রযুক্তিতে অগ্রগামী দেশের শীর্ষ তালিকায় স্থান করে নিয়েছে তারা।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকার। তার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি উপদেষ্টা খ্যাতিমান কম্পিউটার বিজ্ঞানী, বয়সে তরুণ, আধুনিক ও বিজ্ঞানমনস্ক। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী সাংসদ, তারুণ্যের চিন্তা-চেতনার ধারক ও বুদ্ধিদীপ্ত। তাদের ভাবনায় রয়েছে আমাদের যুবশক্তিকে তথ্য-প্রযুক্তিতে প্রশিক্ষিত করে দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা। বিশেষ করে যারা মোটামুটি শিক্ষিত এবং প্রতিবছর বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ও স্নাকোত্তর ডিগ্রি নিয়ে বের হচ্ছে ওই সব তরুণ-তরুণীকে প্রশিক্ষণের আওতায় নিয়ে আসবেন। এটা সম্ভব হলে ২০২৫ সালের মধ্যেই দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অবদান অন্তত ৪০ শতাংশ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। তখন শুধু আত্মনির্ভরশীল মানুষ নয়, বিশ্বে বাঙালিরা একটি আত্মনির্ভরশীল জাতি হিসেবে গড়ে উঠবে।

লেখক : বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা), মনিটরিং কর্মকর্তা, মনিটরিং অ্যান্ড ইভ্যালুয়েশান উইং,
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা

হরিণের বাণিজ্যিক চাষ

মোঃ কামরুল ইসলাম

JDS স্কলারশিপের বদৌলতে প্রায় ১৩ মাস জাপানের অবস্থানের সুযোগ হয়েছিল। ভার্সিটি ছিল টোকিও শহরের প্রাণকেন্দ্রে। আর থাকতাম টোকিওর শহরতলি এলাকায়, যেখানে 'হীরা হালাল ফুড' নামে একটা দোকান ছিল। ওই দোকানে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, শ্রীলঙ্কা প্রভৃতি এলাকার মানুষের চাহিদা অনুযায়ী জিনিসপত্র পাওয়া যেত। ওই এলাকায় বসবাসকারী অন্য রিজিওনের মুসলিমদেরও আসতে দেখতাম। অনেক জাপানিও আসত। এই দোকানের ম্যানেজার ছিলেন সিলেটের নাজমুল হুদা সাহেব। হুদা ভাই অমায়িক মানুষ। ছয়-সাতটা ভাষায় কথা বলতে পারেন। এমনকি তামিল ভাষাও। এই গল্পটা করার বিশেষ কারণ হলো, হুদা ভাইয়ের দোকানে জাপানের পাহাড়ি হরিণের গোস্ত পাওয়া যেত। কেজি ২০০০ ইয়েনের মতো। বাংলাদেশেও হরিণের গোস্ত খাইতে মন চায়। কিন্তু উপায় নাই। আমাদের আইনে হরিণ বন্য প্রাণী হিসেবে তালিকাভুক্ত। তাই পূর্ব অনুমতি ব্যতীত হরিণের যেকোনো ধরনের লালন-পালন অথবা বিক্রি অথবা হত্যা অথবা শোভাবর্ধনের জন্য হরিণের চামড়া বা শিংয়ের ব্যবহার শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

হরিণ ছাগলের মতোই একটা প্রাণী। বাংলাদেশের আবহাওয়া হরিণের বাণিজ্যিক চাষের উপযোগী। হরিণের প্রজননের নির্দিষ্ট কোনো ঋতু নেই। এদের গর্ভধারণকাল সাত মাস। প্রতিবারে এরা এক-দুটি বাচ্চা প্রসব করে। দুই বছরের মধ্যে এরা প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে ওঠে এবং ওজন দাঁড়ায় ৭০-৮০ কেজি। জানামতে, পৃথিবীর অন্যতম উন্নত জাতের ছাগল 'বোয়ার'-এর জাত উন্নয়ন হয়েছে পুরুষ হরিণের সাথে মা ছাগলের ক্রস ব্রিডিংয়ের মাধ্যমে।

সরকার চাইলে শর্ত সাপেক্ষে হরিণের বাণিজ্যিক খামারের অনুমতি দিতে পারে। এতে বাজারে প্রাণিজ প্রোটিনের সরবরাহ চেইনে স্থায়ী একটা শৌখিন বিকল্প আসবে এবং গরু বা খাসির গোস্তের চাহিদা কিছুটা কমবে। কোরবানির সময় পশুর বাজারেও এটা ভালো বিকল্প হতে পারে। মোট কথা বাণিজ্যিকভাবে হরিণের চাষ বড় একটা অর্থনৈতিক সম্ভাবনা নিয়ে আসবে। নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। গোস্ত, চামড়া, হাড় বা শিং রপ্তানি হতে পারে। এটা হাজার হাজার কোটি টাকার একটা সম্ভাবনা।

বাংলাদেশের হরিণ নিয়ে দরকারি তথ্য

- বাংলাদেশে মোট পাঁচ প্রজাতির হরিণ রয়েছে। হগ হরিণ, সোয়াম্প হরিণ, বারকিং হরিণ, সাম্বার হরিণ ও চিত্রা হরিণ।
- এর মধ্যে হগ হরিণ, সোয়াম্প হরিণ বিলুপ্তপ্রায়।
- হারিয়ে যাওয়ার পথে বারকিং হরিণ ও সাম্বার হরিণ। এখন সিলেটের গভীর বন ও কাপ্তাই এবং বান্দারবানে কদাচিৎ দেখা যায়।
- বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় দুই লাখ চিত্রল হরিণ রয়েছে। চিত্রল হরিণের মূল বসতি এলাকা সুন্দরবনে রয়েছে প্রায় দেড় লাখ। সরকার নিঝুম দ্বীপে হরিণ ছেড়েছিল। এ বনে হরিণের খাবার সংকট ও প্রিডেটর সমস্যা না থাকায় মাত্র এক যুগেই হরিণ বেড়ে যায় হাজারে হাজার। এই দ্বীপে রয়েছে ১২ থেকে ১৫ হাজার। চট্টগ্রাম পাহাড়ি এলাকা, মধুপুর বন ও সিলেটের গভীর বনে হাতে গোনা কিছু চিত্রা হরিণ থাকতে পারে। এ ছাড়া চর কুকরিমুকরি, বাঁশখালীসহ উপকূলীয় বনে বিচ্ছিন্নভাবে হরিণের বসতি রয়েছে।
- বন্য প্রাণী সংরক্ষণে মামলা পরিচালনার জন্য সুন্দরবন এলাকায় আটটি বন আদালতও আছে।

এখন হরিণের বাণিজ্যিক চাষের কিছু দিকে আলোকপাত করা যাক

- সরকার চাইলে আগ্রহী খামারিদের নিকট হতে জেলাভিত্তিক আবেদন গ্রহণ করতে পারে। খামারের অবকাঠামো পরিদর্শনপূর্বক অনুমোদন দেওয়া যায়।
- অনুমোদন পাওয়া খামারের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় জনবল জেলা প্রাণিসম্পদের অফিস থেকে পর্যাপ্ত/ন্যূনতম প্রশিক্ষণ নেবে।
- প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ সাপেক্ষে সরকার অনুমোদনপ্রাপ্ত খামারিদের মাঝে খামারের আয়তন অনুসারে প্রজননে সক্ষম হরিণ ব্রুড হিসেবে নির্দিষ্ট মূল্যে সরবরাহ করবে।
- ব্রুড হিসেবে দেওয়া সংখ্যার অন্তত ৩/৪/৫ গুণ হরিণ খামারে মজুদ রেখে উদ্বৃত্ত সংখ্যা খোলাবাজারে বিক্রি বা বিদেশে রপ্তানি করা যাবে।
- দেশীয় জাত উন্নয়নের জন্য কাঙ্ক্ষিত মানের উন্নত হরিণ প্রয়োজনীয় অনুমোদন সাপেক্ষে আমদানি করা যেতে পারে। খামারের আয়তনভেদে প্রতি খামারে আমদানীকৃত হরিণের সংখ্যা ৬, ১২ বা ১৮ হতে পারে।
- জীবিত হরিণ বা হরিণের গোস্ত বা চামড়া বা হাড় রপ্তানির ওপর প্রণোদনা থাকতে পারে।
- বাণিজ্যিকভাবে হরিণ চাষ নতুন বিষয় হওয়ায় খামারি পর্যায়ে হরিণের চিকিৎসায় প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, ওষুধ ও চিকিৎসকের সহজলভ্যতা সৃষ্টি করতে হবে। এ ব্যাপারে কিছু প্রণোদনাও থাকতে পারে।

বাংলাদেশে হরিণের বাণিজ্যিক চাষে আইনি বাধ্যবাধকতাসমূহ

- চিত্রল হরিণ পোষা সংক্রান্ত নীতিমালা-২০০৯
- হরিণ লালন-পালন নীতিমালা-২০১০
- বন্য প্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন-২০১২
- হাতি ও হরিণ লালন-পালন বিধিমালা-২০১৭

বিভিন্ন আইন, নীতিমালা বা বিধিমালা পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে, বন বিভাগের কাছ থেকে প্রাথমিক অনুমোদন সাপেক্ষে বনের হরিণ বাসাবাড়ি এবং খামারে লালন-পালনের জন্য যে সুযোগ রয়েছে, তাতে চিত্রল ছাড়া অন্য কোনো হরিণ পোষা যাবে না। চিত্রল হরিণ পাওয়া যায় এমন কোনো বনের ৩০ কিলোমিটারের মধ্যে এই হরিণ পোষা যাবে না। ব্যক্তিপর্যায়ে সর্বোচ্চ ১০টি চিত্রল হরিণ পোষা যাবে। এর বেশি হলে খামার হিসেবে অনুমতি নিতে হবে। বন বিভাগ ও চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ নিজস্ব নিয়ম অনুযায়ী হরিণ বিক্রি করতে পারবে। কিন্তু খামার বা ব্যক্তিপর্যায়ে হরিণ কিনতে হলে বন বিভাগের কাছ থেকে 'পজিশন সার্টিফিকেট' নিতে হবে। খামারের হরিণ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট বন সংরক্ষক ও ব্যক্তিগত হরিণের ক্ষেত্রে বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কাছে বার্ষিক প্রতিবেদন দিতে হবে। হরিণ পরিণত হলে তার মাংস খাওয়া যাবে। বাচ্চা প্রসব করলে বা মারা গেলে ঘটনা ঘটার ১৫ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বন বিভাগের কাছে তা জানাতে হবে। হরিণের মাংস বা কোনো অঙ্গ স্থানান্তর করতে হলে বা কাউকে হরিণ দান করতে হলে বন বিভাগকে অবহিত করতে হবে।

হরিণ পালনের বিষয়ে বিভিন্ন আইন, নীতিমালা বা বিধিমালায় প্রদত্ত সুযোগগুলো অনেকাংশে শৌখিন ব্যাপার। বাংলাদেশে দ্রুত বনের পরিমাণ কমে যাচ্ছে। সামাজিক বনায়ন হলেও সেগুলো প্রাকৃতিকভাবে হরিণের প্রাকৃতিক বসবাসের উপযোগী নয়। বাণিজ্যিকভাবে হরিণ চাষের সুযোগ সৃষ্টি হলে হরিণের প্রজনন বাড়বে এবং হরিণ বিলুপ্তি হতে রক্ষা পাবে। দেশের মানুষ প্রাণিজ প্রোটিনের নতুন একটা উৎস পাবে। নতুন কর্মসংস্থান হবে। অর্থনীতিতেও একটা নতুন ক্ষেত্র উন্মোচিত হবে।

লেখক : বিসিএস (পুলিশ) এডিসি ওয়ারী জোন, ডিএমপি, ঢাকা

ভিন্নরকম কর

তাপস কুমার চন্দ

সারা বিশ্বে প্রাচীনকাল থেকেই রাষ্ট্রের জন্য রাজস্ব উপার্জন এবং জনসাধারণের জন্য বিভিন্ন অবকাঠামো উন্নত করতে সরকার কর ব্যবস্থা চালু রেখেছে। নাগরিকদের বাধ্যতামূলকভাবে সরকারকে হরেক রকমের কর প্রদান করতে হয়। বাংলাদেশেও বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের কর চালু আছে। যেমন– আয়কর, মূল্য সংযোজন কর, পৌর কর, ভূমি কর ইত্যাদি। কর ব্যবস্থার ইতিহাস ঘাঁটলে স্বাভাবিক কর আরোপের বাইরেও বিভিন্ন দেশে অদ্ভুত ও আজব প্রকৃতির কিছু কর ব্যবস্থার কথা জানতে পাওয়া যায়। এখানে উল্লেখযোগ্য তেমন কয়েকটি ভিন্ন রকমের কর ব্যবস্থার সাথে পরিচয় করে দিতেই এ ক্ষুদ্র প্রয়াস।

চর্বি কর

চর্বি কর বা 'Fat Tax' প্রাচীনতম পরিচিত করগুলোর মধ্যে একটি। প্রাচীন মিশরে, রান্নার তেলের ওপর কর আরোপ করা হতো। লোকজন চর্বি বা রান্নার তেল পুনরায় ব্যবহার করার অনুমতি পেতনা, ফলে তাদের এটি নতুন করে কেনাছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। কী ভাবছেন, স্বাস্থ্য সচেতনতার কারণে এমন আইনের প্রয়োগ? আসলে তা নয়। প্রকৃতপক্ষে চর্বি বা রান্নার তেল একচেটিয়া ভাবে বিক্রির অধিকার ছিল সে সময়কার ফারাওদের।

প্রস্রাব কর

Pecunia non olet-Money doesn't stink!

টাকা নাকি কখনো গন্ধ ছড়ায় না? ল্যাটিন এ প্রবাদটির জন্য প্রযোজ্য উৎকৃষ্ট করের প্রয়োগ আমরা দেখতে পাই প্রাচীন রোমে আরোপিত অদ্ভুত এক কর আরোপের ঘটনায়। সেই সময়ে, মানুষের মূত্রকে একটি মূল্যবান পণ্য হিসেবে বিবেচনা করা হতো। কারণ পাবলিক ইউরিনাল থেকে প্রস্রাব বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ার জন্য একটি অপরিহার্য উপাদান হিসেবে বিক্রি করা হতো। সম্রাট নিরো প্রথম শতাব্দীতে প্রস্রাবের ওপর প্রথম কর ধার্য করেন vectigal urinae নামে। নিরোর এ কর ব্যবস্থাটি কিছুদিন পরেই বাতিল করা হয়েছিল, কিন্তু রাষ্ট্রীয় কোষাগার পূরণের জন্য ৭০ খ্রিস্টাব্দের দিকে রোমান সম্রাট ভেসপাসিয়ান (Vaspasian) রোমের পাবলিক-ইউরিনাল থেকে প্রস্রাবের সংগ্রহের ওপর প্রস্রাব কর পুনরায় চালু করা হয়েছিল। রোমান নিম্ন শ্রেণির লোকেরা হাঁড়িতে প্রস্রাব করত, যেগুলো পরে পাবলিক-ইউরিনালে স্থাপিত ট্যাংকে খালি করা হতো। এসব পাবলিক-ইউরিনাল থেকে সংগৃহীত প্রস্রাব বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ার উপাদান হিসেবে বিক্রি করা হতো। এটি ট্যানিং করা, উলের উৎপাদন এবং অ্যামোনিয়ার উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হতো।

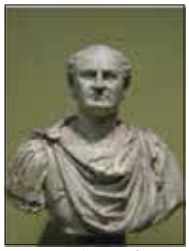

রোমান সম্রাট ভেসপাসিয়ান (Vaspasian) (17 November 9 AD-23 June 79 BC))

Beard tax

সম্রাট পিটার দ্য গ্রেটের আরোপকৃত দাড়ি করের জন্য ১৭০৫ সালের দাড়ি টোকেন

১৬৯৮ সালে, রাশিয়ার সম্রাট পিটার রাশিয়ান সমাজকে পশ্চিম ইউরোপীয় ফ্যাশনের সাথে সংগতিপূর্ণ করার অংশ হিসেবে দাড়ি কর চালু করে ছিলেন। যারা সম্রাট পিটারের আরোপিত এ জাতীয় কর প্রদানে অস্বীকার করত তাদেরকে জোর পূর্বক প্রকাশ্যে শেভ করানো হতো। সম্রাট এ আইনের সফল প্রয়োগের জন্য পুলিশকে বিশেষ ক্ষমতা দিয়েছিলেন। দাড়ি করের পরিমাণ নির্ভর করত দাড়িওয়ালা ব্যক্তির অবস্থার ওপর। যারা ইম্পেরিয়াল কোর্ট, সামরিক বা সরকারের সাথে যুক্ত ছিল তাদের বার্ষিক ৬০ রুবল চার্জ করা হতো; ধনী বণিকদের ক্ষেত্রে ১০০ রুবল আর অন্যান্য বণিক এবং শহরের লোকদের জন্য প্রতি বছরে ৬০ রুবল। কৃষকরা যখন গ্রামীণ এলাকা থেকে শহরে প্রবেশ করত প্রতিবার দাড়ি কর আদায় করা হতো। যারা কর প্রদান করত তাদের একটি তামা বা রুপার টোকেন বা 'দাড়ির টোকেন' বহন করতে হতো। এ আইন জারির কারণে সেসময় কর দিয়ে দাড়ি রাখা একটা আভিজাত্যের প্রতীক হয়ে ওঠে। তবে ক্যাথরিন দ্য গ্রেট ১৭৭২ সালে দাড়ি কর ব্যবস্থা আনুষ্ঠানিক ভাবে বাতিল করেন।

Window tax

A House in portland Street aouthampton, with bricked-up spaces in place of windows

এই ট্যাক্সটি প্রথম ১৬৯৬ সালে রাজা তৃতীয় উইলিয়াম এর অধীনে ইংল্যান্ড এবং ওয়েলসে চালু করা হয়েছিল। জানালার ওপর এই ট্যাক্সটি আরোপ করা হতো, কারণ বেশি আয়ের লোকেরা সাধারণত সুন্দর বাড়িতে থাকত আর সুন্দর বাড়িতে সাধারণত দুটির বেশি জানালা থাকে। তাদের বাড়ির জানালার সংখ্যার ওপর ভিত্তি করে সরকার কর আরোপ করে। এর ফলে কর পরিশোধ এড়াতে জানালা কমিয়ে বা জানালা ছাড়াই বিশেষভাবে বাড়ি তৈরি করার হিড়িক পড়ে যায়। প্রাকৃতিক আলো এবং বায়ু চলাচলের অভাবে স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি বিবেচনায় এ বিষয়ে নেতিবাচক প্রভাবের কারণে আন্দোলন গড়ে ওঠে। ফলে ১৮৫১ সালে এ কর বন্ধ করে দেওয়া হয়।

ওয়ালপেপার এর উপর কর

ইংল্যান্ড ১৭১২ সালে রানি অ্যানের রাজত্বকালে মুদ্রিত ওয়ালপেপারের ওপর কর আরোপ করা হয়। বিল্ডাররা সাধারণ ওয়ালপেপার ঝুলিয়ে এবং তারপর দেয়ালে প্যাটার্ন আঁকার মাধ্যমে ট্যাক্স এড়িয়ে যায়। ১৮৩৬ সালে এই কর বিলুপ্ত করা হয়েছিল।

টুপিট্যাক্স

সরকারের রাজস্ব বাড়ানোর লক্ষ্যে ১৭৮৪ সালে ইংল্যান্ড টুপির ওপর কর আরোপ ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। ধনী ব্যক্তিরা অসংখ্য টুপি কিনতে পারত, যেখানে গরিবদের একটি সস্তা টুপি পরিধান করতে হতো। যারা টুপির কর পরিশোধ করতে ব্যর্থ হতো তাদের ওপর বড় অঙ্কের জরিমানা আরোপ করা হতো। এর ফলে কর এড়াতে কিছু টুপি প্রস্তুতকারী তাদের প্রোডাক্টের নাম পরিবর্তন করে, টুপি প্রস্তুতকারীরা তাদের প্রোডাক্টকে 'টুপি' বলা বন্ধ করে দেয়। অবশেষে ১৮১১ সালে এই কর বাতিল করা হয়েছিল।

মোমবাতির ওপর কর

ইংল্যান্ড ১৭৮৯ সালে মোমবাতির ওপর কর চালু করে। লাইসেন্সধারী ব্যতীত কেউ তাদের নিজ গৃহস্থালির জন্যও মোমবাতি তৈরি করতে পারতনা। ১৮৩১ সালে অজনপ্রিয় এই ট্যাক্সটি বাতিল করা হয়েছিল।

পরচুলা কর

১৭৯৫ সালে ইংল্যান্ড পুরুষ এবং মহিলারা তাদের পরচুলা বা উইগগুলোতে যে সুগন্ধযুক্ত গুঁড়া রাখত তার ওপর কর আরোপ করেছিল। এখাতে কর আদায়ের কারণে কর এড়ানোর জন্য মানুষ উইগের ব্যবহার অনেক কমিয়ে দেয়।

ঘড়ি কর

১৭৯৭ সালে ঘড়ি এবং ঘড়ির মতো সমস্ত টাইমপিসে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ঘড়ি কর আরোপ করা হয়েছিল। একটি আদর্শ ঘড়ির জন্য বার্ষিক কর হার ছিল দুই শিলিং এবং ছয় পেন্স এবং একটি সোনার ঘড়ির জন্য দশ শিলিং পর্যন্ত। কুড়ি শিলিংয়ের বেশি দামের ঘড়ির কর পাঁচ শিলিংয়ে নির্ধারণ করা হয়েছিল।

লবণ কর

ব্রিটিশরা লবণের ওপর কর আরোপ করে। লবণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিনিস হওয়ায় এর ওপর কর আরোপের ঘটনায় মহাত্মা গান্ধী যখন এর বিরুদ্ধে অহিংস প্রতিবাদ করেন তখন লবণের কর বিশ্বব্যাপী মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়।

টেলিভিশন কর

ইংল্যান্ডে টেলিভিশনের ওপর কর চালু আছে। আপনি যদি আপনার বাড়িতে একটি টেলিভিশনের মালিক হন, তাহলে আপনার মালিকানাধীন প্রতিটি টেলিভিশনের জন্য আপনাকে একটি বার্ষিক ফি দিতে হবে। সাদা-কালো টেলিভিশনের তুলনায় রঙিন টেলিভিশনগুলোর জন্য উচ্চ হারে কর আদায় করা হয়। এমনকি যদি একজন ব্যক্তি অন্ধ হয় আর তার বাড়িতে একটি টিভি থাকে, তবে তাকেও নির্ধারিত করের অর্ধেক কর পরিশোধ করতে হবে। এই ফি দিতে ব্যর্থ হলে ফৌজদারি জরিমানা হতে পারে। শুধু ২০১৯ সালে সঠিক ভাবে এখাতে কর প্রদান না করায় ১,১৪,০০০ জন দোষী সাব্যস্ত হয়েছে এবং তাদের ওপর জরিমানা আরোপ করা হয়েছে।

পশুপাখি পালনে কর

পাঞ্জাব সরকার ২০১৭ সালে এ কর চালু করে। গরু, কুকুর, বিড়াল, শূকর, ভেড়া ইত্যাদির মতো বিভিন্ন গৃহপালিত প্রাণীর মালিকদের ওপর এ কর ধার্য করা হয়েছিল। যাদের কুকুর, বিড়াল, শূকর, ভেড়া, হরিণ গৃহপালিত প্রাণী হিসেবে রয়েছে তাদের বছরে ২৫০ রুপি এবং মহিষ, উট, ষাঁড়, ঘোড়া গরু এবং হাতির মালিক তাদের বছরে ৫০০ রুপি ট্যাক্স দিতে হয়।

টয়লেট ফ্ল্যাশ ট্যাক্স

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ডে জল সংরক্ষণের অভিপ্রায়ে টয়লেট ফ্ল্যাশ ট্যাক্স ধার্য করা হয়েছিল। অনুমোদিত সীমার বেশি কেউ টয়লেটে পানি ফ্ল্যাশ করলে প্রতিমাসে পাঁচ ডলার কর আরোপ করা হতো। টয়লেট ফ্ল্যাশ ট্যাক্স ধার্য করে সঞ্চিত অর্থ মেরিল্যান্ডের পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল।

ব্যাচেলর ট্যাক্স

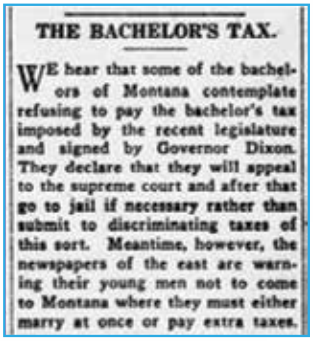

THE BACHELOR'S TAX.

WE hear that some of the bachelors of Montana contemplate refusing to pay the bachelor's tax imposed by the recent legislature and signed by Governor Dixon. They declare that they will appeal to the supreme court and after that go to jail if necessary rather than submit to discriminating taxes of this sort. Meantime, however, the newspapers of the east are warning their young men not to come to Montana where they must either marry at once or pay extra taxes.

The Bachelors' Tax" Great Falls Tribune, Apr.15.1921

অবিবাহিত পুরুষদের ওপর আরোপিত একটি শাস্তিমূলক কর। প্রাচীন রোম, অটোমান সাম্রাজ্যে, ইংল্যান্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইতালি, রোমানিয়া সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সময়ে সময়ে এ কর আরোপের প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে ১৯০০ সালের দিকে আর্জেন্টিনায় ব্যাচেলর কর ব্যবস্থাটি বিশেষ কারণে বিখ্যাত। যেসব পুরুষ প্রমাণ করতে পারত যে তারা কোনো মহিলাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে এবং প্রত্যাখ্যাত হয়েছে তাদেরকে এ হাস্যকর কর থেকে অব্যাহতি দেওয়া হতো।

মজার ব্যাপার হলো,ব্যাচেলর কর থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য তখন পেশাদার 'Lady Rejectors' নামে মহিলাদের গ্রুপ তৈরি হয়েছিল। তারা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কর্তৃপক্ষের কাছে সাক্ষ্য দিত যে একজন পুরুষ তাকে প্রস্তাব করেছিল এবং সে ওই পুরুষকে প্রত্যাখ্যান করেছিল।

তথ্যসূত্র : অন্তর্জাল

লেখক : বিসিএস (কর), উপ-কর কমিশনার, কর অঞ্চল-৩, চট্টগ্রাম

ইউরোপ ভ্রমণের স্মৃতি

মোহাম্মদ শাহ আলম

শিক্ষা ক্যাডার থেকে জনপ্রশাসনের Scholarship পাওয়া সৌভাগ্যের ব্যাপার, দুই-তিনবার ভাইভার পরে সুযোগ মেলে। ডোনাল্ড ট্রাম্প আসার পর ভিসায় চরম কড়াকড়ি, সব কিছু ঠিকঠাকের পরও FIU যাওয়া হলো না ভিসা প্রত্যাখ্যাত হওয়ার কারণে। জনপ্রশাসনে যোগাযোগ করার পরেও লাভ হলো না, do or die, অগত্যা যেতেই হলো Reading-এ। প্রথম থেকেই একটু চ্যালেঞ্জিংয়ের ব্যাপার ছিল; কারণ পুকুর থেকে সমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়ার মতো! ০৩.১০.১৭ Reading শহরে পদার্পণ করি, পুরো ক্যাম্পাসে বাংলাদেশি সব মিলিয়ে পাঁচ কিংবা ছয়জন (১৮ সালের চিত্র ভিন্ন হতে থাকে) অথচ লন্ডন থেকে খুবই কাছের শহর! পড়াশোনার চাপে প্রায় এক বছরে লন্ডনে যাওয়া হয়েছিল চার পাচ বার! ০৫.০৮.১৮ সালে থিসিস জমা দেওয়া শেষ, এর ২৭ ব্যাচের এক ভাই ইউরোপ যাওয়ার itinary প্রস্তুত করে রেখেছিলেন।

১০.০৮.১৮ সালের পড়ন্ত বিকেলে আমাদের যাত্রা শুরু; ২৭ ব্যাচের একজন, আমি, ৩১ ব্যাচের একজন, বাংলাদেশি ব্রিটিশ পাসপোর্টধারী একজন, যার ব্যক্তিগত গাড়িতে ইউরোপের উদ্দেশে যাত্রা। প্রথমেই সবাই একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা জমা দিলাম ইউরো exchange-এর জন্য, ব্যস্ততা বা রেট কমের কারণেই হোক তখনকার মতো ইউরো বা অন্য মুদ্রা কেনার সুযোগ হয়নি। গাড়ি প্রথমে চালাচ্ছিলেন ব্রিটিশ বাংলাদেশি ভাই। প্রায় সন্ধ্যার কাছাকাছি সময়েই ডোবার কাছাকাছি উপস্থিত হই। ফেরি পার হয়ে ফ্রান্সের মধ্য দিয়ে যেতে থাকি। রিডিং বা লন্ডনে এত প্রশস্ত বা বিস্তৃত রাস্তা দেখার সুযোগ হয়নি, রাতের আলো-আঁধারিতে এত দ্রুতগতিতে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা প্রথম। রাস্তার পাশেই তেল বা গ্যাস স্টপজে অন্যান্য সুযোগ থাকে, সবাই মোটামুটি তখন ক্ষুধার্ত; ব্রিটিশ ভাই বাসা থেকে মুরগি, গরু গোশত আর রুটি নিয়েছিলেন, আপাতত সেটা দিয়েই রাতের খাবারের ব্যবস্থা হলো। খাবারের পরে ড্রাইভিং সিটে এলো আরেকজন, ফ্রান্সের পথে বেলজিয়ামের উদ্দেশে। আমার ধারণা ছিল যে হোটেল বুকিং করা আছে বা অন্য কোনো ব্যবস্থা হয়তো ঠিক করা ছিল, পরে বুঝতে পারলাম যে কোনো ব্যবস্থা হয়নি। প্রায় রাত ৪টায় আমরা বেলজিয়াম এসে পৌঁছাই; শীতের রাত এবং রাতের জার্নিতে মোটামুটি সবাই ক্লান্ত। সকালের আগে তো কোথাও যাওয়া সম্ভব নয়, বিশেষভাবে আমরা দেখতে চাই আবার বাংলাদেশের মতো রাস্তার পাশেই পার্কিংয়ের সুবিধা নেই, একটু ঝুঁকি নিয়েই একটু ভেতরে ঢুকে ঘণ্টাখানেক চুপিসারে গাড়ি নিয়ে আমরা বিশ্রামের চিন্তা করি আর আল্লাহ আল্লাহ করি, যাতে অযথা পুলিশের বিড়ম্বনার শিকার না হই। ঘণ্টাখানেক পরেই সকাল হয়।

১১.০৮.১৮ তারিখ ভোরেই আমরা বেলজিয়াম ঘুরতে থাকি। ব্রাসেলসে ইউরোপিয়ান সদর দপ্তর, এরপর নেপোলিয়ান স্মৃতিবিজড়িত যুদ্ধক্ষেত্র যখন দেখতে যাই, দেখা সম্ভব হয়নি কারণ সংস্কারকাজের জন্য আপাত স্থগিত। ঘড়িতে তখন প্রায় ১০টা বা ১১টা তখনো কিছু খেতে না পারা আর নেপোলিয়নের ওই জায়গা না দেখতে পারার কারণে মন কিছুটা খারাপ। এর মধ্যে বেলজিয়ামে ইউরো কিনতে না পারায় সবার ভেতরে চিন্তা দানা বাঁধছে। দেখতে দেখতে বেলজিয়াম আর ইউরো কেনা হয়নি। বাংলাদেশের মতো সহজে সবাই ফ্রি সার্ভিস দেয় না, যার কারণে হাতে ওই দেশি মুদ্রা বা আন্তর্জাতিক ক্রেডিট বা ডেবিট কার্ড না থাকলে নানামুখী বিড়ম্বনার সম্মুখীন হতে হয়। বেলজিয়াম থেকে লুক্সেমবার্গের পথে আবার যাত্রাবিরতি, সম্ভবত গাড়ির জন্য তেল দরকার বাট পাউন্ড exchange করার উপায় নেই। উপায় না দেখে ব্রিটিশ ভাইয়ের ক্রেডিড কার্ডের সাহায্য নিতে হলো, কিন্তু কোনো এক সমস্যার কারণে কার্ড কাজ করছে না, চিন্তায় যখন সবাই অস্থির, তখন আমার Natwest ব্যাংকের কার্ড দিয়ে পরীক্ষা চালালাম, পরীক্ষা সফল হওয়ায় সবাই আপাতত বিপদমুক্ত হলাম। লুক্সেমবার্গে বিশাল রাস্তা, একদম নিরিবিলি, কখনো পাহাড়ের মাঝে ঢুকে যাছি, কখনো বিশাল সবুজের মাঝে শুধু রাস্তা আর রাস্তা। যেহেতু ইউরোপিয়ানদের খাবার স্টাইল ভিন্ন, সেহেতু রাস্তায় ঢুঁ মারলেই খাবার পাওয়া যায় না, আবার খাবারের দোকান থাকলেও নানা চিন্তায় ঢোকার চিন্তা বাদ দিতে হতো। ভাগ্যক্রমে একটা ছোটখাটো মসজিদ দেখতে পাই, ফ্রেশ হওয়ার জন্য খানিকটা সময় কাটাই। টার্কিশ বংশোদ্ভূত কিছু লোকের বসবাস ওই এলাকায়; কারণ মধ্যযুগে অটোমানদের আধিপত্যের সংস্কৃতি এখনো নিভু নিভু অনেক জায়গায়।

সামান্য বিস্কুট আর চায়ের সৌজন্যে কিছুটা স্বস্তি এলো সবার মাঝে। ধন্যবাদ দিয়ে আমরা রওনা হলাম, সাড়ে ৩টা কি ৪টায় লুক্সেমবার্গ সিটিতে হাজির হলাম। যেহেতু ক্ষুধায় মোটামুটি সবাই অস্থির, ২-৩টা টার্কিশ ফুডের দোকান পাওয়া যাওয়ায় সবাই কিছুটা হলেও খুশি হলাম; কারণ সবাই জায়গায় খেতে ইচ্ছুক ছিলাম না। লন্ডন থেকে শুরু করে পুরো ইউরোপেই টার্কিশ ফুডের একটা প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। পরোটা আর কাবাব খেয়ে আপাতত ক্ষুধা নিবারণ করলাম। হাতে খুব কম সময় থাকায় বেশি জায়গা দেখা হয়নি। জিডিপি-সমৃদ্ধ দেশের কারণে ছোট দেশ বিসিএস পরীক্ষার্থীদের কাছে পরিচিত, পরিচ্ছন্ন শহর আর উঁচু দালানের কারণে এর আগের দেখা শহরগুলো থেকে লুক্সেমবার্গ সিটিকে ভিন্ন মনে হয়েছে। শহরের ইউনেস্কোর হেরিটেজখ্যাত স্থানটি দেখতে গেলাম। কিছুটা উঁচু আর পাহাড়ি এলাকা হওয়ায় আমাদের গাড়ি নিয়ে উঠতে বেশ বেগ পেতে হলেও শেষে জায়গাটি পরিদর্শন করে বেশ ভাগ্যবান মনে হলো। রাতেই সুইজারল্যান্ডের উদ্দেশে রওনা দিলাম। প্রায় ঘুম ঘুম চোখে সুইজারল্যান্ডের জুরিখে পৌঁছতে প্রায় রাত ১০টা বেজে যায়। আগের রাতে গাড়িতে ছিলাম, এবার আর সম্ভব নয়, তাই হোটেলে গেলাম রুম খুঁজতে। বিধি বাম, বছরে একবার একটা উৎসব হয়, যেখানে লক্ষাধিক লোকের সমাগম হয়। বিভিন্ন হোটেল খোঁজাখুঁজির পর ঠিকানা হলো আগের দিনের মতোই গাড়ি। গাড়ি তো সব জায়গায় রাখা যায় না, সিদ্ধান্ত হলো জুরিখ রেইন ফলের সামনে রাতে গাড়ি রাখলে সমস্যা হবে না, যদি ভোর হওয়ার আগেই সবাই জেগে যাই। রেইন ফলের সামনে তীব্র শীত আর গাদাগাদি করে কোনোমতে রাত পার করলাম।

১২.০৮.১৮

খুব ভোরেই সবাই উঠে গিয়ে ফ্রেশ হই, যদিও ভোর হতে না হতেই পর্যটকদের ভিড়ে স্বাভাবিকভাবেই সব কিছুতেই লাইন ধরতে গিয়ে বিড়ম্বনার শিকার হতে হয়েছিল। রাইন নদীর রেইন ফলের বিখ্যাত ঝরনা দেখতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে পর্যটকরা ভিড় করে থাকে। রাইনসহ অনেক নদীর ওপর নির্মিত ব্রিজে প্রেমিক-প্রেমিকাদের love lock চোখে পড়ার মতে-া–অনেকটা মানতের মতো, তালার ওপর দুজনের নাম লিখে ঝুলিয়ে রাখা সম্পর্ক ভাঙবে না। সকাল সকাল রেইন ফলের ফটোসেশন পর্ব সেরে যাত্রা শুরু ইতালির দিকে। মাঝখানে মনে হলো লিনশেশ্টাইন দেশটা ছোট, অথচ অনেকটি দেশের সাথে লাগোয়া landlocked county!

এখানে ঢোকার আগেই পাউন্ড exchange করার সুযোগ হলো বাট ইউরো সব জায়গায় নেয়, এমন পরিস্থিতি দেখা যায়নি। হালকা নাশতা শেষে গুগলের সাহায্যে যখন পাহাড়ি এলাকায় ওই দেশটি কোথায়, খুঁজে পেতে কষ্ট হচ্ছিল; কারণ কেউ কারো ভাষা বুঝতে পারছিলাম না আবার লোকজন একেবারেই কম। ইশারা-ইঙ্গিতে যা বুঝলাম আমরা প্রেসিডেন্ট বা রাজার বাড়িতেই ঢুকে যাচ্ছি, ভাবলাম বন্দি হওয়ার আগেই প্রস্থান করি! নিচে নেমে ফটোসেশন করি। এরপর সুইজারল্যান্ডের পাহাড়ি পথ ধরে ইতালির উদ্দেশে রওনা হই।

ইতালির রাস্তা, পর্যটক ঢুকলেই বুঝতে পারবেন অন্য দেশগুলোর তুলনায় আর্থিকভাবে দুর্বল অবস্থায় আছে, হাইওয়ে রাস্তায় কিছুক্ষণ পর পর যেভাবে টোল নেয়, আমাদের গরিব পর্যটকদের জন্য এইটা ভালোই আপত্তিকর! তুরিন বা মিলানের বা সুইজারল্যান্ডের রাস্তাগুলো যেকোনোজনকেই নব্বইয়ের বাংলাদেশের পাহাড়ি রাস্তার বা ভারতের শিমলা মালানি ভয়ংকর রাস্তার অভিজ্ঞতা স্মরণ করিয়ে দেবে, বেঁচে গেলে আর নয়! সুইজারল্যান্ড-ফ্রান্সের রাস্তায় পাহাড়ি বাঁকের এক পাশ হাজারো ফুট গভীর, একবার তাকালেই শেষ! মিলানের রাস্তা যেন শেষ হয় না, একদিকে পাহাড়ি রাস্তা অন্যদিকে টোলের উৎপাতে ভ্রমণের আনন্দ কিছুটা বিবর্ণ হয়ে যায়। আবার নির্ধারিত কয়েন না থাকলে অটোমেটিক গেট পার হয়ে ফ্রেশরুমে যাওয়া মুশকিল (যাত্রাবিরতিতে)। দুপুরের নাগাদ মিলান শহরের পৌঁছে যাই। বড় ভাইয়ের শ্যালকের সৌজন্যে মিলান শহরে সবাই গোসল করে ফ্রেশ হয়ে যাই, দুপুরে দেশীয় খাবার গ্রহণ করি, দুই দিনের ক্লান্তি শেষে কিছুটা স্বস্তি ফিরে আসে সবার মাঝে। বিকেলে ইউরোপীয় পুনর্জাগরণের হৃদভূমি ফ্লোরেন্স যাই। ৩১ ব্যাচের এক ভাইয়ের আত্মীয়ের বাসায় রাত পর্যন্ত সবাই অবস্থান করি। রবিবার হওয়ায় ফ্লোরেন্স বেশ লোকে লোকারণ্য। রাত ৩টায় নাগাদ সবাই উঠে আবার রোমের উদ্দেশে রওনা দিই।

১৩.০৮.১৮

সকাল ৮টায় আমরা প্রাচীন ও মধ্যযুগের সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র রোমে পৌঁছে যাই। আমার কানে কোরআনের সুরা রুমের গুলিবাতে রুম, অর্থাৎ রোমকরা পরাজিত হয়েছে, এই আয়াত বারবার দোলন দিচ্ছে আর চোখে ভাসছে গ্লাডিয়েটর সিনেমার ম্যাক্সিমাসের লড়াইয়ের দৃশ্য। পুরো যাত্রায় আমাদের দুজনের খাবারের প্রতি আগ্রহ ছিল না বললেই চলে আর আমার আর ব্রিটিশ ভাই (ডায়াবেটিসের রোগী) হওয়ায় কিছুক্ষণ পরে ক্ষুধা লেগে যেত। ভ্যাটিক্যানের সর্বোচ্চ চূড়ার কাছাকাছি উঠে নামার পরে আমাদের দুজনের অবস্থা প্রায় শেষ! ভ্যাটিকানের পাশাপাশি আরো কিছু জায়গা দেখতে না দেখতেই দুপুর হয়ে যায়। দুপুরে আমরা ভেনিসে গিয়ে রাতে পৌঁছে যাই। সেখানে ২৭ ব্যাচের এক আত্মীয়ের বাসায় উঠি। রাতে ও পরের দিনের আপ্যায়ন পর্ব বেশ ভালো ছিল। খুব ভালো একটা ঘুম হয় রাতে।

১৪.০৮.১৮

সকাল ৮টার পরে ট্রেনে ভেনিসের পর্যটনকেন্দ্র চলে যাই। অপূর্ব এই শহরে না এলে অনেক কিছুই মিস করতে হয়! সাম্পানের মতো ছোট নৌকায় চড়ে ভেনিসের এই পর্যটনকেন্দ্র ঘুরে ঘুরে দেখতেই প্রায় দুপুর হয়ে যায়। বাসায় এসে ফ্রেশ হয়ে আবার বিকেলে রওনা হই ফ্রান্সের উদ্দেশে।

১৫.০৮.১০

সারা রাতের জার্নি শেষে সবাই যখন প্যারিসের আইফেল টাওয়ারের সামনে তখন কাকডাকা ভোর। সৌন্দর্যের নগরী পারিতে আইফেল টাওয়ারের সামনে ময়লার স্তূপ দেখে মনে হলো গুলিস্তান, অনেকেই বিশ্বাস করবেন না দেখে ওই সময় ছবি উঠিয়ে রেখেছিলাম। আইফেল টাওয়ারের ওপরে উঠতে হলে আরো এক দিন প্যারিসে থাকতে হবে, তাই সকালেই সামনের থেকে ছবি ওঠালাম আর ল্যুভরের সামনে গিয়ে ছবি ওঠালেন দুজন। সবাই সিদ্ধান্ত নিল, আপাত যাত্রা এখন লন্ডনমুখী হোক।

ফ্রান্সের বর্ডার পার হলাম। বিপত্তি লাগল যখন টক বর্ডার পার হব, সবাই একেক করে ইমিগ্রেশন পার হচ্ছে, আমার বেলায় এসে দেখা গেল BRP নেই। সবাইকে বিপদে ফেলে দিলাম! সবাই খুবই চিন্তিত। অফিসার কেমন জানি সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকায়! ব্রিটিশ পাসপোর্টধারী বাট বাংলাদেশের অরিজিন দেখে মনে হয় উনিও কোনো ছাড় পেলেন। কিছুক্ষণ পরে এলো আরেকজন, কোথায় দেশের বাড়ি, কোথায় পড়ছি? কিছুটা পজিটিভ মনে হলো, Reading meteorology-এর একটা সুনাম পুরো UK বা ইউরোপজুড়েই আছে, BRP একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস, এটা থাকা উচিত ছিল। পরে সবাইকে ইমিগ্রেশনের ব্যাপারে সহযোগিতা করলে ডোবার পার হয়ে লন্ডনে পৌঁছতে পৌঁছতে প্রায় বিকেল।

লন্ডনে প্রায় বাংলাদেশের মতো ভাব, খাবারদাবারও একেবারেই দেশি স্বাদ! ৮ বা ১০ পাউন্ডের বুফে একটা দোকান সামনে পাওয়া গেল, সবাই ভালোই অভুক্ত। আর কে ছাড়ে, মনের ইচ্ছেমতো খাওয়া। রাতে রিডিংয়ে চলে এলাম ট্রেনে।

চার-পাঁচ দিনের বিশাল ভ্রমণের পরে জনপ্রতি ৪০০-৪৫০ খুবই অল্প, যার কৃতিত্ব পুরোটাই ২৭ ব্যাচের সমবায় ক্যাডারের ওই ভাইয়ের। অবশ্যই ব্রিটিশ বাংলাদেশি ভাইয়ের গাড়ির জন্য ভ্রমণটা অনেক আরামদায়ক ও উপভোগ্য হয়েছে, যার জন্য তার প্রতি অনেক কৃতজ্ঞ।

লেখক : বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা), সহকারী অধ্যাপক, ভূগোল বিভাগ, সদরপুর সরকারি কলেজ, ফরিদপুর

নেকটার থেকে বগুড়ায়

সালমা মোস্তফা নুসরাত

নেকটার থেকে 'ত্রিশতম আইসিটি বিষয়ক শিক্ষক প্রশিক্ষণ' কোর্সে অংশগ্রহণ করার জন্য পত্র প্রেরণ করা হলো; করোনার মধ্যে খুশিমনে যাত্রা করলাম।

১৯৮৪ সালে প্রতিষ্ঠিত 'জাতীয় বহুভাষী সাঁটলিপি প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমি' সংক্ষেপে NTRAMS-কে বিলুপ্ত ঘোষণা করে যুগের চাহিদার সাথে মিল রেখে যথাযথ অবদান রাখার নিমিত্তে সরকার ২০০৫ সালে জাতীয় সংসদের ১২ নম্বর আইনের মাধ্যমে 'জাতীয় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমি' (NACTAR) প্রতিষ্ঠা করে। বর্তমানে এটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও গবেষণামূলক সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান। এটি বগুড়ায় জাহাঙ্গীরাবাদ সেনানিবাসের প্রতিবেশী। এখানে এসে জীবনে প্রথম একটা রোবট ছুঁয়ে দেখলাম। এক ফেসবুক বন্ধু বলেছে, রোবটটি নাকি তার কয়েকজন পরিচিত ছোট ভাই তৈরি করেছে। ওরা নাকি দেশের চতুর্থ হিউম্যানয়েড রোবটও তৈরি করেছিল।

বগুড়াতে এসে এখানকার দই খাব না তা তো আর হতে পারে না।

দই মিষ্টি ক্ষীরসা/রাজা বাদশাহ শেরশাহ/মসজিদ মন্দির মূর্চাঘর/এসব মিলেই শেরপুর...১৯৪৭ সালে গৌরগোপাল ভারত থেকে সপরিবারে বগুড়ার শেরপুরে আসেন। তিনি দই বানিয়ে ভাড়ে নিয়ে হেঁটে হেঁটে বগুড়ার বনানী এলাকায় এটা বিক্রি করতেন; সাথে থাকত সরভাজা। এই সরভাজাই পরবর্তীতে সরার দই হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। এটা তার ভাগ্যের চাকা ঘুরিয়ে দিয়েছিল। বগুড়ার মোহাম্মদ আলীর নওয়াব পরিবার খুশি হয়ে তাকে তাদের প্যালেসের আম্রকাননে থাকতে দেন। ষাটের দশকের শেষভাগ পর্যন্ত তার উত্তরসূরিরা সেখানে ছিল। এরপর শেরপুরের ঘেটু ঘোষ টকদই বানানো শুরু করেন। সেটাই বিবর্তিত হয়ে চিনিপাতা দই বা মিষ্টি দইয়ে পরিণত হয়েছে। ষাটের দশকের প্রথম ভাগে ব্রিটেনের রানি এলিজাবেথের জন্য বগুড়ার দই পাঠানো হয়েছিল। তদানীন্তন পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি আইয়ুব খান ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তাদের জন্য বগুড়ার দই পাঠিয়েছিলেন। পূর্বে ঘোষরা কঠোরভাবে গোপনীয়তা বজায় রেখে দই তৈরি করত; তবে পরবর্তীতে তারা এটা আর ধরে রাখতে পারেনি। আগের সেই একচ্ছত্র আধিপত্যও তাদের নেই। এখন অনেক মুসলমান কারিগর দই বানায়। এই দই খেতে গিয়ে লক্ষ করলাম এটাতে মাত্রাতিরিক্ত মিষ্টি নেই; যার ফলে শেষ পর্যন্ত খেয়ে যেতে খারাপ লাগেনি।

নেকটারের মহিলা রোবট

বগুড়া জেলার একমাত্র নবাব মরহুম আব্দুস সুবাহান চৌধুরীর আর্থিক সহায়তায় জেলা magistrate কুমার রমেন্দ্র কৃষ্ণদেব রায় বাহাদুরের মাধ্যমে ১৯০১ থেকে ১৯০৫ সালের মধ্যে বগুড়া এডওয়ার্ড পৌর পার্কটি নির্মাণ করা হয়। রানি ভিক্টোরিয়ার পুত্র ভারতের সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের নামে পার্কটির নামকরণ করা হয়েছিল। বর্তমানে পার্কটির ভেতরে রাজার একটি আবক্ষ মূর্তি আছে। এখনো পার্কের মধ্যে বেশ কিছু বয়োজ্যেষ্ঠ বৃক্ষের উপস্থিতি লক্ষ করা গেছে। পূর্বে এখানে tennis ground, play ground, green house ছিল। এখন এখানে আনন্দ সরোবর, কৃত্রিম ফোয়ারা, পায়রা চত্বর, কৃত্রিম পাহাড় আছে।

পায়রা চত্বরটি ১৯১৩ সালে নির্মাণ করা হয়েছিল। পার্কটির আরো দুটি উল্লেখযোগ্য স্থাপনা হচ্ছে উডবার্ন পাবলিক লাইব্রেরি ও Dramatic Edward Hall; যা এখন শহীদ টিটু মিলনায়তন নামে পরিচিত। পূর্বে এটাকে Town Hall বা বক্তৃতা মঞ্চ হিসেবে ব্যবহার করা হতো। বগুড়াতে ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর হানাদার বাহিনী সবার আগে এখানে আত্মসমর্পণ করেছিল।

করতোয়া নদীর তীরে অবস্থিত বগুড়া শহরের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সড়ক

১. সাতমাথা- এই রাস্তার মোড়ে সাত দিক থেকে সাতটি রাস্তা এসে মিলিত হয়েছে। এ জন্য এই রাস্তার মোড়ের নাম সাতমাথা।

২. রোমেনা আফাজ সড়ক - দস্যু বনহুরের স্রষ্টা রোমেনা আফাজের বাড়ির সামনের সড়কটি রোমেনা আফাজ সড়ক নামে পরিচিত। একসময় 'দস্যু বনহুর' নামে একটি সিনেমা নির্মাণ করা হয়েছিল; ওটাতে অঞ্জনা, সোহেল রানা ও জসিম অভিনয় করেছিলেন। 'ডোরাকাটা দাগ দেখলে বাঘ চেনা যায়' গানটি ওই সময় ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।

৩. দত্তবাড়ি- এই নামে শহরটিতে রাস্তা আছে। এটি একটি তীর্থক্ষেত্রও বটে। এখানে একটি মন্দির স্থাপন করেছিলেন দত্ত পরিবারের হারাধন দত্ত, হরিধন দত্ত ও গদাধর দত্ত। ১৯৪৭-এর পর বিহারি মুসলিমরা মন্দিরের চারপাশের জায়গা দখল করে ফেললে বসন্তকুমার দত্ত ও হরিনারায়ণ দত্ত প্রাণপণ চেষ্টায় মন্দির রক্ষা করেন। এই দুই ভাই মিলে ১৯৬৭ সালে এই মন্দির রক্ষার জন্য বগুড়ার সম্মানিত হিন্দুদের নিয়ে দত্তবাড়ি দেবসেবা ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করেন। মন্দির প্রাঙ্গণে বসে থাকা বশীর নামের একজন বয়োজ্যেষ্ঠ লোকের সাথে কথা বলে জানতে পারলাম তার বাবা ও বাবার অপর তিনজন ভাই ১৯৬৮ সালে মুর্শিদাবাদ থেকে এখানে চলে আসেন। ওখানে তার কাপড়ের ব্যবসা ছিল; এখানে এসে তিনি কাচের বাসনকোসন বিক্রির ব্যবসা শুরু করেছিলেন।

জন্মাষ্টমী উপলক্ষে একদিন আমাদের প্রশিক্ষণ বন্ধ ছিল। ওই দিন সবাই মিলে মহাস্থানগড়ে বেড়াতে গিয়ে যা দেখলাম-

১. গোবিন্দ ভিটা- বগুড়াতে করতোয়া নদীর তীরে এটা অবস্থিত। গোবিন্দভিটা শব্দের অর্থ গোবিন্দ (হিন্দু দেবতা) তথা বিষ্ণুর আবাস। কিন্তু এখানে বৈষ্ণব ধর্মের কোনো নিদর্শন পাওয়া যায়নি। আদতে এটা একটা মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ।

২. জাহাজঘাটা- বিখ্যাত চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং ৬৩৯-৬৪৫ খ্রিষ্টাব্দে নদীপথে এখানে এসেছিলেন; তার মানে তখন এখানে জাহাজ চলাচল করত।

৩. হযরত শাহ সুলতান বলখী মাহি সাওয়ার (রহ.)-এর মাজার শরিফ- এই মহাপুরুষ সুদূর বল্লখদেশ থেকে ইসলাম ধর্ম প্রচার করার জন্য মহাস্থান গড়ে এসেছিলেন। এখানে এসে তিনি হিন্দু রাজা পরশুরামকে পরাজিত করেন এবং ইসলাম ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করেন। The Rise of Islam and the Bengal Frontier, ১২০৪-১৭৬০ নামের পুস্তকে Richard M. Eaton রীতিমতো বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছেন, এটা একটা আশ্চর্যের ব্যাপার যে, হঠাৎ করে কীভাবে পূর্ব বাংলায় মুসলমানদের সংখ্যা এত বেড়ে গেল; পরবর্তীতে এ ঘটনাই ১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান নামের দুটো ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র তৈরি করার পথ সুগম করে দিল। তবে মাজারে টাইলসের ব্যবহার দৃষ্টিকটু।

৪. খোদার পাথও ভিটা- এটি মাজারের পূর্ব পাহাড়ে অবস্থিত। এটা একটা মসৃণ পাথর, যা প্রকৃতিতে সহজে পাওয়া যায় না। ধারণা করা হয়, রাজা পরশুরাম এটা জোগাড় করে মসৃণ করে এটাতে পশু বলি দিতেন। স্থানীয় লোকজন এটার এরূপ নামকরণ করেছে। অনেকে এটাতে দুধ ঢেলে ভক্তি জানায়।

৫. গোকুল মেধ (বেহুলা লখিন্দরের বাসর ঘর)- ইবনে বতুতা ও হিউয়েন সাঙ এটাকে একটা প্রাচীন বৌদ্ধ মঠ বলে উল্লেখ করেছেন। অনেক ঐতিহাসিক গ্রন্থে এটাকে একটি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র বলা হয়েছে, যেটা পুণ্ড্রবর্ধনের রাজধানীকে শত্রুর কাছ থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করত। অনেকে মনে করেন, এখানে একটি শিবমন্দির ছিল।

মাস্টারনি হওয়ায় পুরনো স্কুল, কলেজ বেশ ভালো লাগে; গেলাম সরকারি আজিজুল হক কলেজটি দেখতে।

অবিভক্ত বাংলার শিক্ষামন্ত্রী স্যার আজিজুল হকের নামানুসারে ১৯৩৯ সালে বগুড়ায় সরকারি আজিজুল হক কলেজটি স্থাপিত হয়। উনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য থাকা অবস্থায় কলেজটি অধিভুক্তি লাভ করে বিধায় বগুড়াবাসী তার প্রতি সম্মান জানিয়ে কলেজের এরূপ নামকরণ করে। তর উল্লেখযোগ্য কীর্তিগুলো হচ্ছে সরকারি স্কুলে ইংরেজির বদলে বাংলা মাধ্যমে পাঠদান করা, প্রাথমিক শিক্ষা পরিকল্পনাকে অ্যাক্টে রূপান্তর, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ চালু করা, শিক্ষা সপ্তাহ পালন, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপনা কসভার মহাজনী বিল ও প্রজাস্বত্ব আইন চালু করা। ১৯৫৩ সালে এই কলেজে সহশিক্ষা কার্যক্রম চালু হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এটাই ছিল প্রথম কলেজ যেখানে সম্মান শ্রেণিতে পাঠদান করা হতো। এই কলেজের পাঠাগারে প্রায় ২২,০০০ বই আছে। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, সৈয়দ মুজতবা আলী এই কলেজের শিক্ষক ছিলেন। বিশাল এলাকা জুড়ে কলেজটি অবস্থিত। জীবনে এই প্রথম এত বিশাল এলাকা জুড়ে অবস্থিত কোনো সরকারি কলেজ দেখলাম।

একদিন বাইরে খেতে ইচ্ছে হলো; বাইরে খেতে গিয়ে অন্য রকম এক হোটেলের কথা শুনলাম।

১৯১১ সালে জনাব আকবর আলী বগুড়া শহরে আকবরিয়া গ্র্যান্ড হোটেলটি চালু করেন। তিনি মুর্শিদা বাদ থেকে বগুড়ায় এসে ভাইয়ের সাথে মেকানিক্যাল কাজ করা শুরু করেন। ওই সময় বগুড়া শহরে মুসলমানদের জন্য খাবারের কোনো ভালো ব্যবস্থা ছিল না। হিন্দু ভাই-বোনেরা মুসলমানদের ছোঁয়া একদম এড়িয়ে চলত; দেশভাগের দাবি তো আর এমনি এমনি ওঠেনি। এ জন্য জনাব আকবর আলী মুসলমানদের জন্য একটি খাবার হোটেল স্থাপন করার কথা ভাবলেন। প্রথম দিকে পুঁজি না থাকায় তিনি মিষ্টি বানিয়ে তা ফেরি করে বিক্রি করতেন। এর কিছুদিন পর স্বল্প পুঁজি নিয়ে তিনি তার ব্যবসা শুরু করেন। কিছুটা মুনাফা লাভ করার পর তিনি একটি অভিনব সিদ্ধান্ত নিলেন। প্রতিদিন রাতের ১১টা থেকে ১২টার মধ্যে ১০০ জন মুসাফিরকে বিনা মূল্যে খাওয়ানো শুরু করলেন। তার ছেলেরা এই ধারা এখনো অব্যাহত রেখেছেন। প্রতি রাতে হোটেলে ও সামনের রাস্তায় বিনা মূল্যে দরিদ্র মানুষদের খাওয়ানো হয়। ওই সময় তাদের জন্য নতুন করে উন্নতমানের খাবার রান্না করা হয়। খাবার শেষ হয়ে গেলে আবার রান্না করা হয়। এতেই বোঝা যায়, এই বংশের লোকজন কতটা আজিজি। চল্লিশ থেকে ষাটের দশকের মধ্যে ১৫-২০ টাকা দিয়ে এই হোটেলে তিন বেলা খাওয়া যেত। ওই সময় ঘি দিয়ে রান্না করা এক প্লেট বিরিয়ানির দাম ছিল এক টাকা। ব্রিটিশ আমলে বিদ্যুৎ না থাকায় জনাব আকবর আলী নিজস্ব জেনারেটরের মাধ্যমে বিদ্যুতের ব্যবস্থা করেছিলেন।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, এখন যে সারা দেশ জুড়ে বগুড়ার সাদা সেমাইয়ের ব্যাপক খ্যাতি এটার পেছনে এবং জনাব আকবর আলীর অবদান আছে। ওনার আমলে কলকাতা থেকে সেমাই আসত; আকবর আলী সাহেব নিজ উদ্যোগে সেমাই বানানো শুরু করলে সেটাতেও সফল হন। ১৯৭৫ সালে এই আজিজি মানুষটা মৃত্যুবরণ করেন। এখন এই হোটেলে ও কয়েকটি শাখা আছে; কর্মচারীর সংখ্যা ২০০০।

শিক্ষা সফরে আমাদেরকে সোমপুর বিহারে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

Where have all
the flowers gone
long time passing...

আয়তনের দিক থেকে সোমপুর বিহারের সাথে কেবল ভারতের নালন্দা মহাবিহারের তুলনা করা যেতে পারে। প্রায় ৩০০ বছর এই সোমপুর বিহার বৌদ্ধদের ধর্মশিক্ষা কেন্দ্র ছিল। চীন, তিব্বত, মিয়ানমার, মালয়েশিয়া থেকে বৌদ্ধরা পড়াশোনা করতে আসত। অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান এখানকার আচার্য ছিলেন। এখন এটা নওগাঁ জেলার পাহাড়পুর গাঁয়ে অবস্থিত।

সোমপুর মহাবিহার

ইংরেজরা ভারতবর্ষে এসে জরিপ করা শুরু করেছিল। বুকানন হ্যামিলটন, ওয়েস্ট ম্যাকট জরিপ করতে এসে পাহাড়পুর পরিদর্শন করেন এবং ফিরে গিয়ে তাদেও অভিজ্ঞতার কথা পত্রিকায় লেখেন। আলেকজান্ডার কানিং হাম এসব পড়ে পাহাড়পুর খনন করার সিদ্ধান্ত নেন।

বিহারের কেন্দ্রে একটি মন্দির আছে; এটার কেন্দ্রে একটা শূন্য গর্ভ প্রকোষ্ঠ আছে। প্রকোষ্ঠটি তলদেশ থেকে চূড়া পর্যন্ত বিস্তৃত এবং এটাকে কেন্দ্র করেই মন্দিরটি নির্মিত হয়েছে। ইখতিয়ারউদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি বাংলা আক্রমণ করলে উত্তরবঙ্গের বিশাল এলাকা তার দখলে চলে যায়। মুসলমান শাসকদের মূর্তিবিরোধী মনোভাবের কারণে এই বিহার ও মন্দির ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

এখানে যে সকল ভাস্কর্য দেখলাম তাতে নারী ও পুরুষ উভয়ই স্বাস্থ্যবতী ও স্বাস্থ্যবান; বিভিন্ন ধরনের গয়না পরিধান করে আছে। পুরুষ সঙ্গীর সামনে নারী যেন স্বতঃস্ফূর্ত, সমকক্ষ; লজ্জাশীল, অবনতমুখী নয়। পাশ্চাত্যেও ভাস্কর্যগুলোতে নারী ও পুরুষ উভয়ের human body/figure অনেক চিকন ও কিছুটা বাস্তবসম্মত; তারা নিরাভরণ।

একদিন বগুড়ার Momo-Inn ও এটার আশপাশের এলাকায় ঘুরতে গিয়ে শহুরে ও গ্রামীণ পরিবেশের সৌন্দর্য দেখে এত বেশি মুগ্ধ হলাম যে, এটার মালিককে নিয়ে জানতে ইচ্ছে হলো। এটার মালিক হচ্ছে টিএমএসএস (ঠেঙ্গামারা মহিলা সবুজ সংঘ) এনজিও ও নির্বাহী পরিচালক ডক্টর হোসনে আরা বেগম। জনাব হোসনে আরা বেগম পুরুষ হিসেবে জন্মগ্রহণ করে-ছিলেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এমএ শ্রেণিতে পড়ার সময় তিনি একটি দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসকরা বলেছিলেন, তার শরীরের টিউমারটা অপসারণ করতে হলে তাকে নারীতে রূপান্তরিত হতে হবে। ইচ্ছের বিরুদ্ধে তিনি রাজি হন। এভাবে পুরুষ আব্দুস সামাদ নারী হোসনে আরা বেগমে পরিণত হন। এ সময় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন দীর্ঘদিনের বন্ধু অধ্যাপক আনসার আলী। তাকেই জনাব হোসনে আরা বেগম স্বামী হিসেবে গ্রহণ করেন। ছোটবেলা থেকেই জনাব হোসনে আরা বেগম মেধাবী ছিলেন এবং শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেছিলেন। পরবর্তীতে ভিক্ষুকদের মুষ্টি চাল জোগাড় করে এনজিও প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি যখন অষ্টম শ্রেণির ছাত্র তখন বন্ধুদের নিয়ে বয়েজ ক্লাব স্থাপন করেছিলেন; সবাই মিলে জমি চাষ করতেন। সবাই ফসলের সমান ভাগ পেত কিন্তু জমির মালিক হিসেবে তিনি এক ভাগ বেশি নিতেন। গরুর হাল না পেলে দরকার পড়লে ওনারা মানুষজনের বাড়ি থেকে কোদাল এনে হাল চাষ করতেন। এই কীর্তিমানের জন্য বিনম্র শ্রদ্ধা।

এখান থেকে ফেরার সময় বার থেকে একটা বেলজিয়ান বিয়ার কিনে নিয়ে আসলাম। এটাতে ১৬% অ্যালকোহল ছিল এবং কোনো রকম পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ছাড়া এটা হজম করে ফেলেছিলাম; ব্যাপারটা এত সহজ না। এ ধরনের বিয়ার কেবল বেলজিয়ামে পাওয়া যায়। একবার বেলজিয়ামের রাজা ঘোষণা দিয়েছিলেন, চার্চের লোকজন দিনে এক গ্লাসের বেশি বিয়ার পান করতে পারবে না। এ জন্য চার্চের লোকজন মাথা খাটিয়ে এই ঘনত্বের বিয়ার তৈরি করেছিল।

অন্তর্জালে খোঁজ নিয়ে গেলাম খেরুয়া মসজিদটি দেখতে। খেরুয়া মসজিদটি বগুড়া জেলার শেরপুর উপজেলা সদরে অবস্থিত। এটাতে মুঘলপূর্ব সুলতানি আমল ও মুঘল আমলের স্থাপত্য রীতির সংমিশ্রণ দেখা যায়। এটার মেঝে মুঘলরীতিরও ছাঁদ মুঘলপূর্ব সুলতানি আমলের। এটার কার্নিশ কিছুটা বাঁকানো, যেটা বাংলার কুঁড়েঘরের অনুরূপ। মসজিদটির সামনের শিলালিপি দেখে জানা যায়, মির্জা মুরাদ খান কাকশাল এটি নির্মাণ করেন। মসজিদের অপর শিলালিপিটি করাচি জাদুঘরে আছে।

খেরুয়া মসজিদ

'কাকশাল' উপাধিটি তুর্কিদের দেওয়া। শেরপুর সে সময় ঘোড়াঘাটের অধীন একটা প্রশাসনিক কেন্দ্র ছিল। ঘোড়াঘাট তুর্কি জায়গিরদারদের অধীন ছিল। মির্জা মুরাদ খান কাকশাল জায়গিরদার ছিলেন। ওই সময়ে কাকশালদের মাধ্যমে এখানে একটা মুসলিম সমাজ গড়ে উঠেছিল; এরা পরবর্তীতে মুঘলদেও বিরোধিতা করে। তবে শেষ পর্যন্ত মির্জা মুরাদ খান কাকশাল মুঘল শাসকের কাছে নত হয়েছিলেন। আরবি, ফার্সি কোথাও 'খেরুয়া' শব্দের কোনো অর্থ নেই। তবে ফার্সিতে 'খায়েরগাহ' বলে একটা কিছু আছে, যার অর্থ কোনো স্থানের ভেতরে।

রাজা মানসিংহ যখন বাংলার সুবেদার ছিলেন তখন এখানে একটা দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন বলে শোনা যায়; যদি ও এটার কোনো অস্তিত্ব আর নেই। তবে মসজিদটি যদি দুর্গের ভেতরেই ছিল তবে 'খায়েরগাহ'র একটা অর্থ পাওয়া যায়, যেটা কি না পরে হয়তো খেরুয়া হয়ে গেছে। মসজিদটি যখন নির্মাণ করা হয়েছিল তখন বারো ভূঁইয়া, বাংলায় অবস্থানরত আফগান প্রধানরা (৮০ বছর আফগানরা আমাদেরকে শাসন করেছিল) ও কাকশালরা সম্মিলিতভাবে মুঘলদের বিরোধিতা করেছিল।

একটা জটিল, অস্থির সময়ে নির্মাণ করা হয়েছিল বলে অযত্নের ছাপ সুস্পষ্ট। নামাজ আদায় করার নিমিত্তে কোনোমতে এটা নির্মাণ করা হয়েছিল। এই এলাকার আশপাশে অনেক মাজার ও মসজিদ আছে; এখন অবশ্য সব টাইলসে ঢেকে গেছে। এই অঞ্চলের মুসলিম ধর্ম প্রচারকদের নিয়ে কেউ পড়াশোনা, গবেষণা করতে চাইলে এখানে আসতে পারেন। মসজিদটি দেখে আমার প্রতিবেশী কক্ষ সঙ্গীর মন্তব্য'মসজিদটা আসলে অন্য রকমের সুন্দর; এটার ছাদের ওপরে উঠে দেখতে পারলে ভালো হতো।'

একদিন এখানকার অভিজাত এলাকা উপশহর দেখে এসে ফেরার পথে শতবর্ষী একটা স্কুল দেখে রিকশা থামিয়ে নেমে পড়লাম।

বগুড়া করোনেশন ইনস্টিটিউশন এন্ড কলেজ

বগুড়া করোনেশন ইনস্টিটিউশন অ্যান্ড কলেজটি কাটনার পাড়ায় ১২ বিঘা জমির ওপর অবস্থিত। এটি ১৯১২ সালের ১ ফেব্রুয়ারিতে যাত্রা শুরু করেছিল। জেলা প্রশাসক বরদা কান্ত তালুকদার এটা স্থাপন করেছিলেন। তদানীন্তন ভারতীয় উপমহাদেশের সম্রাট পঞ্চম জর্জের নামানুসারে এই স্কুলের নাম প্রথমে জর্জ স্কুল হয়েছিল। পরে ওনার অভিষেককে স্মরণীয় করে রাখতে এটার আগের নামটি বদলে করোনেশন স্কুল রাখা হয়। অনন্য স্থাপত্যরীতির মূল ভবনটি স্কুল প্রাঙ্গণকে অনেক রূপসী, আবেদনময়ী করে রেখেছে। এভাবে এক মাস কেটে গেল; প্রশিক্ষণ শেষ করে নিজ কর্মস্থলে যোগ দিলাম। আবার যদি কোনো দিন যাওয়ার সুযোগ পাই তবে প্রেম যমুনার ঘাটটি দেখে আসব।

লেখক : বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা), সহকারী অধ্যাপক, স্যার আশুতোষ সরকারি কলেজ, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম

ছেলেবেলার কিছু কথা

ডা. আব্দুল্লাহিল আমান

সরকারি চাকরিজীবী বাবা ছিলেন আমার। সেই সুবাদে দেশের এদিক-সেদিক ঘোরাঘুরির সুযোগ হয় আমার। একদম ছোটবেলায়, জন্মের ছয় মাসের মাথায় ছিলাম লক্ষ্মীপুর বাগবাড়ীতে। প্রাক প্রাথমিকের কনসেপ্টটা তখন ছিল না। আম্মা বলেন, মাঝে মাঝের আমাকে বড় ভাইয়ের স্কুলে নিয়ে যাওয়া হতো। বেশ নাদুসনুদুস ছিলাম বলে মাস্টারনিরা কোলে তুলে রাখত! যদিও খুব একটা মনে পড়ে না আমার। এরপর আব্বা বদলি হন সিলেটে। পাঠানটুলায় ছিল আবাস। সেখানে পাঠানটুলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শুরু আমার শিক্ষাজীবন। আমার বন্ধু ছিল রাশেদ। রাশেদ যেদিন তার মামার সাথে স্কুলে ভর্তি হতে যাচ্ছিল, সেদিন আব্বা ছিলেন শ্রীমঙ্গলে কোনো একটা অফিশিয়াল ট্যুরে। মনে পড়ে আম্মাকে ধরেছিলাম, রাশেদের সাথে আমিও স্কুলে যাব। আম্মা পাঠিয়ে দিলেন রাশেদের মামার সাথে। ভর্তি হয়ে গেলাম স্কুলে। খুব সহজ স্কুলে ভর্তি হওয়া। নিজের নাম আর বাবার নাম বললাম। ব্যস, অতটুকুনই। অতি সহজেই শুরু আমার শিক্ষাজীবন। পাঠানটুলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। সুস্পষ্ট মনে পড়ে, টিনশেড এল শেপড স্কুলঘরের কোনার রুমটা ছিল আমার ক্লাসরুম। নতুন বন্ধু পাই আমি, মনোয়ার। কোথায় আছিস মনোয়ার? নিশ্চয়ই ৩২ বছর আগে ফেলে আসা রাশেদ কিংবা মনোয়ারের এখনো মাঝেসাঝে মনে পড়ে আমাকে। আব্বা চক আর শ্লেট কিনে দেন, আমি শ্লেট শেষ করে বাসার ফ্লোরে লিখি 'অ আ ক খ...'।

ওখানেই ছিল 'মিনিস্টারবাড়ি' লাগোয়া বড় একটা পুকুর আর বিশাল একটা মসজিদ। মসজিদে শুক্রবার জুমার পর কলাপাতায় 'শিন্নি' (পায়েস) দেওয়া হতো, কখনো বা বনরুটির ওপর একটুখানি হালুয়া। ওই অমৃতখানি যেন মুখে লেগে আছে এখনো। বোধ করি, মিষ্টির প্রতি আমার দুর্নিবার আকর্ষণ সেখান থেকেই শুরু! বাবার বদলির চাকরি। এইবার আমার গন্তব্য ভোলা। শহরের একপ্রান্তে প্রাণচঞ্চল একটা জনপদ 'বাপ্তা'। আমি ভর্তি হই বাপ্তা শক্তি সঙ্ঘ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। সেখান থেকে একপর্যায়ে ভর্তি হই ভোলা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে ক্লাস ফোরে। ছুটে চলা জীবনে সেবারই প্রথম আমার কোনো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশ নেওয়া এবং তাতে উতরে আসা! সেই এক্সাইটমেন্টটা এখনো বেশ মনে পড়ে। অনেকগুলো দালান ছিল আমার স্কুলে। প্রবেশদ্বারের শুরুতেই ছিল আমাদের ক্লাস। আগের স্কুলের চেয়ে ঢের বেশি ছাত্র। পাল্লা দিয়ে আমার বন্ধুও বাড়ল।

আমার বেশ খেয়াল আছে, তখন ক্লাসের রোল ১, ২, ৩-ই যে ক্যাপ্টেন হবে এমনটি ছিল না। ক্লাসের সকল ছাত্রের ভোটে তা নির্বাচিত হবে এমনটিই ছিল। ক্লাস ফাইভে আমরা তেমনই একটা নির্বাচন করলাম। এতটুকুন বয়সেই গণতান্ত্রিক একটা প্রক্রিয়ার সাথে আমার পরিচয় হলো। স্কুল লাগোয়া বিশাল খেলার মাঠ। তিন টাকা ঘণ্টায় ভাড়া করা সাইকেল নিয়ে আমি শিখে ফেললাম সাইকেল চালানো! আহ, জীবন যেন অন্য রকম গতি পেল! সেই মাঠেই ফি বছর শীতকালে বিশাল ওয়াজ মাহফিল হতো। পুরো শহরেই পড়ে যেত যে সাজসাজ রব। আম্মা যেতেন পাশের বাসার খালাম্মাকে নিয়ে মাঠের কাছাকাছি কোনো এক বাসায় সন্ধ্যার পর ওয়াজ শোনার জন্য। মাঠের পেছনে ওই সময়টায় 'মিষ্টিপান' বিক্রি হতো। খেয়েছিলাম কি? মনে নেই!

বাপ্তায় বসবাসকারীদের বড় একটা অংশ ছিল হিন্দু ধর্মাবলম্বী। বারোয়ারি পূজার পাশাপাশি ছিল দুর্গাপূজা, লক্ষ্মীপূজা আর কালীপূজার বিশাল আয়োজন। বিশাল আকারে পূজামণ্ডপ হতো ফি বছর। পূজার প্রতিমা তৈরির আদ্যোপান্ত স্বচক্ষে দেখার অভিজ্ঞতা সেখানেই। পরে যখন সমরেশের উপন্যাসে এ ধরনের প্লট পাই, তখন প্রসঙ্গটা কল্পনায় নিয়ে আসতে কোনো বেগই পেতে হয়নি। জীবনটাকে কলমের আগায় ফুটিয়ে তুলতে তাদের মুনশিয়ানা টের পাওয়াই যায়। পুরো এলাকাটায় থাকত একটা টানটান উত্তেজনা কেমন হবে দেখতে এবারের প্রতিমা! পূজায় ঢাকের বাদ্যি, সুমিষ্ট 'প্রসাদ' বিতরণ, পুরোহিতের মন্ত্রপাঠ সব কিছুতেই আমরা হাজির। সম্প্রীতি আর অসাম্প্রদায়িক এক সমাজে বেড়ে ওঠা আমাদের।

আব্বার সাথে বাজারে যেতাম আমি। পোয়া মাছ তখন হালিতে বিক্রি হতো, আর ইলিশ বিক্রি হতো সাইজ অনুযায়ী দর-কষাকষি করে। দুধ কিনে নিয়ে যেতাম সাত টাকা কেজি দরে। বাপ্তার পাশেই ছিল জেলা স্টেডিয়াম। ফুটবল তখন তুমুল জনপ্রিয়। আমাদের এলাকায় ছিল মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব। আর সেই ক্লাবেরই মেইন স্ট্রাইকার ছিলেন আমাদের পাশের বাসার খালিদ ভাই। পুরো এলাকা তার ফ্যান, ভালো খেলেন। মনে আছে, স্টেডিয়ামে খালিদ ভাইয়ের খেলা দেখতে গিয়েছিলাম বড় ভাইয়ের সাথে। আমরা গলা ফাটিয়ে গাইছিলাম ইলিশ মাছের তিরিশ কাঁটা বোয়াল মাছের দাড়ি, আবাহনী ভিক্ষে করে মোহামেডানের বাড়ি। আজও ভাবি, কী অদ্ভুত, খেলায় স্লেজিং সেই তখনো ছিল! যাই হোক পর্যাপ্ত নার্সিং পেলে হয়তো আমাদের খালেদ ভাইও একদিন ব্যালন ডি'অর হাতে ছবি তুলতেন! মাটির চুলায় লাকড়ি আর কাঠের ভুসি জ্বালিয়ে রান্না করতেন আম্মা। চুলা বানাতে আম্মা উইপোকার ঢিবির মাটি ইউজ করতেন। তাতে নাকি চুলা পোক্ত হয় বেশ। স্টেডিয়াম এর পেছনের দিকে বেশ কিছু উইপোকার ঢিবি ছিল। সেখান থেকে আমি আর ভাইয়া আম্মাকে মাটি এনে দিতাম। পরে বড় হয়ে জেনেছি যে, বাল্মীকি নাকি উইপোকার ঢিবির ওপর বসে 'রামায়ণ' রচনা করেছিলেন। ওই মাটিতে বসার কী হেকমত তা অবশ্য জানা হয়নি। আমাদের বাসার যিনি বাড়িওয়ালা ছিলেন তার ছিল ভাড়া দেওয়া পাশাপাশি সাত-আটটা ঘর। পেছনে দুটো বড় পুকুর। এক শীতে পুকুরের পানি কিছুটা কমলে বাবার হাত ধরে শিখে ফেলেছিলাম সাঁতার।

আর পুকুরের পেছনে বড়সড় ধানের জমি। শীতের পড়ন্ত বিকেলে পাশের বাসার খালাম্মাদের সাথে আম্মা সেখানে গিয়ে রোদ পোহাতেন আর গল্পে মেতে উঠতেন। আমরা আশপাশে মনের সুখে দৌড়াদৌড়ি করতাম। জমির ওই পাশে ছিল হেলিপ্যাড। মন্ত্রী-মিনিস্টাররা হেলিকপ্টারে করে ভোলা এলে সেখানে নামতেন। একবার মনে হয় দেখেছিলাম হেলিকপ্টার। বনবন করে ঘুরছে বিশালাকার পাখা সেই যন্ত্রদানবের। আমার ক্লাস ফাইভের প্রথম সাময়িক পরীক্ষার পরই আব্বা বদলি হয়ে যান। তার নতুন কর্মস্থল দীঘিনালা, খাগড়াছড়ি। সময়টা ১৯৯২। 'ছোট্ট একটা দেশ। নদীনালা তো দেখলাম, এবার পাহাড়টাও দেখে আসি' বলে বাবা চলে গেলেন জয়েন করতে। ফিরে এসে আমাদেরকেও নিয়ে যাবেন এমনটাই ছিল প্ল্যান। পার্বত্য চট্টগ্রামে তখনো শান্তিচুক্তি হয়নি। বাবা ফিরে এসে জানালেন, সেখানে আমাদেরকে নিয়ে যাওয়াটা সেফ লাগছে না। তাই বাক্সপেটরা গুছিয়ে চলে এলাম মাতুলগৃহে- মাইজদী কোর্ট, নোয়াখালী। গ্রামে কয়েক মাস কাটিয়ে বসতি গাড়লাম শহরে মাইজদী শহর। শুরু হলো বাবাকে ছেড়ে আমাদের থাকা। মাসে একবার আসতেন বাবা। সে সময়টা যেন ঈদের আনন্দ আমাদের দুই ভাইয়ের!

বছরের মাঝামাঝি এসে ভর্তি হলাম নোয়াখালী জিলা স্কুলে। কৈশোরের পুরো সময়টাই কেটেছে আমার এই বিখ্যাত শহরে...

লেখক : বিসিএস (স্বাস্থ্য), সিনিয়র কনসালট্যান্ট, শিশু বিভাগ, সদর হাসপাতাল, নোয়াখালী

Short Story
Death of a Reader
- Banaphul

Translation: Mizanur Rahman

One

It happened a long time ago.
I was sitting at Asanshol station for my train to come. Right beside me was sitting another man. There was a book in his hand. It was quite a thick novel. Through introduction and conversation I came to know that the gentleman would have to wait the whole day for his train to come.
My train was supposed to come three hours after.
Both of us were Bengalis.
Therefore, after not more than five minutes the question I asked him was—could I have a look at your book?
Yes yes, take and have a look—
This very response was natural and expected also.
In no time I grabbed the book.
It was a summer noon of scorching heat.
Asanshol station was a tin-shed.
But everything disappeared.
What a strange novel!
The book owner gentleman once threw a slanted look at me and frowned a little. After that taking out a timetable he concentrated on it.
I kept reading breathtakingly.
Excellent book!
In fact, I had never read such a good novel before.
Absolutely unputdownable!

Two hours passed.
The book owner gentleman after repeatedly leafing through his timetable finally looked at me and said, Your train will no more take much time to come. Now saying so he cleared his voice by hawking a bit.
I was mesmerized still.
In a moment I looked at my wrist watch once. Still there was one hour to go. But I was nearly halfway through the book. I didn't waste time in conversation and continued reading as fast as possible with all attention.
Strange book!

It seemed the last hour flew by.
The bell for my train went.
A large part of the book was still unread.
I was filled with fury!
I said I will board the next train. Not getting up keeping the book unfinished!
The book owner gentleman coughed a little but kept wordless in surprise.
The train went away. I was reading the book.
But even then I couldn't finish the book.
Many pages at the end of the novel were missing.
I told the book owner, Oh! Many pages are missing at the end. Why didn't you tell me earlier?
Tut-tut.
In reply the gentleman merely gazed at me unblinkingly for long. I beheld the veins of his temples had swollen up.

Two

Ten years after I got hold of that very book once again.
In the in-laws' house of my niece.
I escorted her there. I was supposed to be back on that very day. But I stayed to satisfy my greed to read the book.
I procured the book in one opportunity and started reading with much enthusiasm. Without reading the last part sporadically I decided to read from the beginning with relaxation.
After reading a few pages my mind was filled with misgivings.
I turned over the book. Yes, it was that very book!
Again I continued a few pages. No! Something seemed to be wrong.
Yet I kept reading.
After a while I thought to myself No, not possible to continue reading.
Was it the same book that I had read at Asanshol station breathlessly with rapt attention on a scorching summer noon?
How one writes such rubbish!
Impossible to finish reading it!
I never felt when that avid reader of ten years ago had died in me in silence.
The book kept unfinished this time also.

Note: Banaphul is the pseudonym of Balai Chand Mukhopadhyay (1899 – 1079), a 20th century Bengali novelist, short story writer, playwright and poet who is most noted for his very short stories, often just half-page long.

Writer: BCS (General Education), Assistant Professor (English),
Govt. Barhamganj College, Shibchar, Madaripur

কৌতুক

এম এ মোমেন মিয়া

- উত্তর কোরিয়ার শীর্ষ নেতা কিম জং উন তার মন্ত্রিপরিষদ বৈঠকে বলেন, আমরা সূর্যে নভোচারী পাঠাতে চাই।
  উনের মন্ত্রিসভার এক সদস্য বলেন, সূর্য যে রকম উত্তপ্ত জায়গা, আমাদের নভোচারী যদি পুড়ে যায়!
  উন আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেন, রাতের বেলা সূর্যপৃষ্ঠে অবতরণ করলেই হবে। সূর্য তখন শীতল থাকে।
  এই বৈঠকের খবর হোয়াইট হাউসে বসে দেখছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ নেতা ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি অট্টহাসিতে ফেটে পড়েন, উন কি বোকা; রাতের বেলা সূর্য পাবে কোত্থেকে যে নভোচারী সেখানে অবতরণ করবে!

- স্ত্রী তার ছেলেকে সামাজিক বিজ্ঞান পড়াচ্ছেন; কিন্তু ছেলে বুঝতে পারছে না। স্ত্রী আবার স্বামীর সাহায্যের শরণাপন্ন হলেন :
  স্ত্রী : হ্যাঁ গো! শুনছ? এই তোমার ছেলেকে 'ভায়রা ভাই' ব্যাপারটা বুঝিয়ে দাও তো দেখি! বোকাটা কিছুতেই বুঝছে না।
  স্বামী : ও আর কঠিন কী। বলে দাও যে, যখন দুই বা ততোধিক পুরুষ একই কম্পানির প্রোডাক্ট কিনে ঠকে যায়, তবু নিজেদের কাছে যত্নে তা রেখে দেয় সেসব বোকা পুরুষদের একে অপরের 'ভায়রা ভাই' বলে। উদাহরণ–ওর বাবা আর ওর খালু।

- রাজা একদিন দেখতে চাইলেন তার রাজ্যবাসীর ঘরে কার হুকুম চলে? স্বামীর, নাকি স্ত্রীর?
  তিনি রাজ্যে ঘোষণা করলেন, 'যার ঘরে বউয়ের কথা মানা হয় সে রাজপ্রাসাদে এসে একটা করে আপেল নিয়ে যাবে। আর যার ঘরে স্বামীর কথা চলে, সে পাবে একটা ঘোড়া।'
  পরদিন...
  সমস্ত রাজ্যবাসী হাজির, সবাই একটা করে আপেল নিয়ে ঘরে চলে যেতে লাগল...। রাজা ভাবলেন, সন্ধে হয়ে গেল, এখনো কি এমন একজনকেও পাওয়া যাবে না যার ঘরে স্বামীর কথা চলে!
  এমন সময় একজন লম্বা চওড়া স্বাস্থ্য, ইয়া বড় গোঁফওয়ালা এসে বলল, 'আমার ঘরে আমারই কথা চলে।'
  রাজা বেজায় খুশি হয়ে বললেন, 'যাও, আমার ঘোড়াশাল থেকে সব থেকে ভালো ওই কালো ঘোড়াটা তোমায় দিলাম।'
  লোকটা ঘোড়া নিয়ে চলে গেল। রাজা খুশি মনে বললেন, 'যাক অন্তত একজন তো পাওয়া গেল।' কিন্তু কিছুক্ষণ পর দেখা গেল, সেই লোকটা ঘোড়া নিয়ে ফিরে এলো এবং বলল, 'রাজা মশাই, আমাকে ঘোড়াটা পাল্টে দিন, আমার বউ বলল যে কালো রং অশুভ, সাদা শান্তির প্রতীক, তাই সাদা ঘোড়া দিন।'
  রাজা রেগে গেলেন... 'তুই ঘোড়া রেখে একটা আপেল নিয়ে এখনই আমার সামনে থেকে বিদায় হ।'
  রাতের বেলা মন্ত্রী এসে বলল, 'রাজা মশাই, সবাই তো আপেলই নিল! আপেলের বদলে আপনি যদি অন্তত পাঁচ কেজি করে চাল দিতেন, তো আপনার প্রজাদের কিছু সাশ্রয় হতো।'
  রাজা বললেন, 'আমিও সেটাই ভেবেছিলাম, কিন্তু বড় রানি বলল আপেলই ভালো হবে।'
  মন্ত্রী শুধাল, 'রাজা মশাই, আপনাকেও কি একটা আপেল কেটে দেব?'
  রাজা লজ্জিত হয়ে বললেন, 'সে কথা থাক, আগে বলো তুমি রাজসভায় আগে এই মতামত না দিয়ে, এখন কেন দিতে এসেছ এই রাতের বেলায়?'
  মন্ত্রীর লাজুক উত্তর, 'আগামীকাল সকালেই বলতাম, কিন্তু আমার বউ বলল, এখনই যাও, আর রাজা মশাইকে বুদ্ধিটা এখনই দিয়ে এসো, যাতে করে পরের বারে চাল দেওয়ার ঘোষণা দেন উনি।'
  রাজা স্বস্তির হাসি হেসে বললেন, 'আপেলটা তুমি নিয়ে যাবে? নাকি ঘরে পাঠিয়ে দেব?'

লেখক : বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা), সহকারী অধ্যাপক, দর্শন, গুরুদয়াল সরকারি কলেজ, কিশোরগঞ্জ

বঙ্গবন্ধু

মেহেরুন্নেছা শাপলা

বঙ্গবন্ধুকে দেখেছি আমি ছায়া সুনিবিড়
গ্রামের মেঠো পথে।
আমি বঙ্গবন্ধুকে দেখেছি ফসলের মাঠে
সবুজ কচি ধানের ডগায়,
যেখানে শিশির থেকে মুক্তো ঝরে।
আমি দেখেছি তাকে শিমুল পলাশ বনে,
আমি দেখেছি তাকে শরতে
শিউলি ফুলের হাসিতে,
বঙ্গবন্ধুকে দেখেছি আমি কৃষকের ঘামে ভেজা শরীরে,
শক্ত বাহুর মজবুত পেশিতে।
বঙ্গবন্ধুকে দেখেছি আমি শিশুদের কোলাহলে,
বঙ্গবন্ধুকে দেখেছি আমি একুশের প্রভাতফেরিতে,
বঙ্গবন্ধুকে দেখেছি আমি তারুণ্যের মিছিলে,
যে মিছিলে বজ্রকণ্ঠে ধ্বনিত হয় 'জয় বাংলা'।
বঙ্গবন্ধুকে আমি দেখেছি বঙ্গোপসাগরের তীব্র ঢেউয়ের দোলায়।
বঙ্গবন্ধুকে দেখেছি ১৬ ডিসেম্বরের বিজয় মেলায়।
বঙ্গবন্ধুকে দেখেছি আমি সকালের সূর্যোদয়ে,
ঘুমন্ত প্রাণে যে আলো ছোঁয়ায়।
বঙ্গবন্ধুকে দেখেছি আমি মার্চের আগুন লাগা সন্ধ্যায়।
বঙ্গবন্ধুকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি শহীদ নূর হোসেনের মৃতদেহের পাশে,
অশ্রুসজল চোখে।
বঙ্গবন্ধুকে দেখেছি আমি, পেয়েছি আমি
আমার কল্পনায়, স্বপ্নে, অনুভবে।
বঙ্গবন্ধু আছে, থাকবে, যত দিন পৃথিবীতে
থাকবে প্রাণের স্পন্দন
আরো লক্ষ কোটি বছর পরে।

প্রেষণে : বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা), সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ
নারায়ণগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ, নারায়ণগঞ্জ

এক মহাপুরুষ

ইয়াছমিন আক্তার লিপি

তিনি এক মহীরূহ,
রন্ধ্রে রন্ধ্রে যার ছিল মানবপ্রেম
রক্ত মাংস শিহরিত হতো যার দুঃখ কষ্টে
আত্মা যার অন্দোলিত হতো সাধারণের লাঞ্ছনা বঞ্চনায়
স্বপ্নের শুরুটা যার টুঙ্গিপাড়ায় শেষটা স্বাধীন বাংলাদেশ
নিঃস্বার্থ ভালোবাসায় প্রমাণ দিয়েছিলেন তিনিই মহীরূহ।
তিনি এক মহাসমুদ্র,
তার তর্জন গর্জন শত্রুর বুকে ধরাত কাঁপন
যার ডাক ছেষট্টি, ঊনসত্তর, সত্তর পেরিয়ে পৌঁছে গিয়েছিল একাত্তরে
উলম্বিত তর্জনী যার ডাক দিয়েছিল স্বাধীনতার
অন্যায় অত্যাচারে জর্জরিত দেহ মনখানি নিয়ে
আন্দোলনের জোয়ারে ভাসিয়ে প্রমাণ করেন তিনি এক মহাসমুদ্র।
তিনি এক মহাপুরুষ,
দৃষ্টি যার স্থির, কণ্ঠ যার বজ্রধ্বনি
যার দৃঢ়চেতা মনোভাব হার মানায় শত্রুদের
যার এক জ্বালাময়ী ডাক জাতিকে ধাবিত করে সম্মুখসমরে
মহানুভবতা দিয়ে যিনি শত্রু মিত্রকে দাঁড় করিয়েছিলেন এক কাতারে
বুকের রক্ত দিয়ে প্রমাণ করেন তিনিই সত্যিকারের মহাপুরুষ।

লেখক : বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা), সহকারী অধ্যাপক, রসায়ন, গজারিয়া সরকারি কলেজ, মুন্সীগঞ্জ

মুজিবর মুজিবর

ড. মোঃ নাজমুল আহসান মুরাদ

৫৬ হাজার বর্গমাইলের এই বাংলায়
শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় অমর অজয়
একটি নাম মুজিবর মুজিবর।

৫২ থেকে ৭১ ইতিহাসের প্রতিটি পৃষ্ঠায়
বাঙালির অস্থি-মজ্জায়
একটি নাম মুজিবর মুজিবর।

মায়ের ভাষার দাবিতে
মিছিল মিটিং সভাতে
একটি নাম মুজিবর মুজিবর।

শোক ও শক্তির প্রতীক শহিদ মিনার
সালাম বরকত রফিক জব্বার আর
একটি নাম মুজিবর মুজিবর।

চুয়ান্নর নির্বাচন, বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন
অধিকার আদায়ের সংগ্রামে
একটি নাম মুজিবর মুজিবর।

৬৬'র ছয় দফা, ৬৯'র গণ-অভ্যুত্থান
বাঙালি সত্তায় স্বাধিকার স্বাধিকার
একটি নাম মুজিবর মুজিবর।

৭০'র নির্বাচনে নিরঙ্কুশ জয়
বাঙালি নির্ভীক অকুতোভয়
একটি নাম মুজিবর মুজিবর।

৭ই মার্চে বঙ্গবন্ধুর উদাত্ত আহ্বান
বাঙালির রক্তে বাঘের গর্জন
একটি নাম মুজিবর মুজিবর।

৯ মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম শেষে
বিজয়ের বেশে ১৬ই ডিসেম্বর
একটি নাম মুজিবর মুজিবর।

বিজয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী ও মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলার
তবেই সার্থক মুজিবর মুজিবর।

লেখক : বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা), সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ), মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর বাংলাদেশ, ঢাকা

শতবর্ষে মুজিব

গোপী নাথ ঘোষ

আজি এ শতবর্ষে তব স্পর্শের খোঁজে
স্মরি তোমায় বিনম্রতায় হে কবিবর।
তুমি জন্মাও দুর্লভ নির্লোভ বৃত্তে
আশাহীন বৃত্তে দাও খোঁজ চিত্তের।
যেথা ভয় সংশয় ধায় শূন্যে আশায় জাগায় চিত্ত
তুমি নিত্য তুমি নৃত্য।
অদ্ভুত তুমি, হে উদার, হে বন্ধু,
বাংলাকে করেছো গীতিনাট্য
তোমার আশায় আশা জাগায়
জাগায় ভাব প্রেমাবেগ।
তোমার স্বপ্নে স্বপ্ন দেখি, গড়ি স্বদেশ স্বর্গ
তুমি বঙ্গের বন্ধু, হে মুজিব, হে বঙ্গবন্ধু।

লেখক : বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা), সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ
মুমিনুন্নিসা সরকারি মহিলা কলেজ, ময়মনসিংহ

মুক্তির কবিতা

মোঃ ফজলুল কবির পাভেল

বিবর্ণ রাত্রি নেমে এসেছিল
নেমে এসেছিল এক ঘোর অন্ধকার,
স্বপ্নের আবেশে জেগে থাকা মানুষ
আশায় ছিল সামনের মুক্তির সম্ভাবনার।

সোনার বাংলায় এসেছিল কালো মেঘ
নয় মাসের যুদ্ধ শেষে এসেছিল সুদিন,
প্রাণের ভাষা উঠেছিল জেগে
স্বপ্ন সব হয়েছিল রঙিন।

একদিন শান্তি এসেছিল ভোরের বাতাসে
এসেছিল ঠিক মুক্তির আলো,
গুঞ্জরিত হয়ে উঠেছিল চারদিক
অন্ধকার দূর হয়ে এসেছিল নতুন আলো।

লেখক : বিসিএস (স্বাস্থ্য), ওএসডি, প্রেষণে : নিউরোমেডিসিন বিভাগ, রাজশাহী মেডিকেল কলেজ, রাজশাহী

অবিনাশী সত্তা

মোঃ আতিকুর রহমান

তুমিই সে অমর, অপরাজেয়, অবিনাশী সত্তা,
জনতাকে উদ্বুদ্ধ করার শ্রুতিমধুর অদ্বিতীয় বক্তা।
তুমিই মহাকালের সুতীব্র ঝলমলে এক নক্ষত্র,
বুকের প্রতিটি তপ্ত রক্তকণিকায় যে এঁকে দিয়েছ,
বাংলাদেশের গৌরবময় জাগ্রত স্থায়ী মানচিত্র।
অন্যায়ের সাথে আপোস করতে চাওনি বলে, যে
জেলখানার চার দেয়ালের সংকীর্ণ গণ্ডিখানিকে,
হাসিমুখে আপন ললাটে আলপনা করে এঁকে নিয়েছ।
সাড়ে সাত কোটি শোষিত, বঞ্চিত বাঙালিকে,
দুঃশাসনের রাহুগ্রাস হতে মুক্তি দিবে বলে, যে
ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছিলে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রিত্ব।
তুমিই সে অজেয়, দুর্বার সত্তা, চির বেগবান,
জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
'৭৫-এর ১৫ আগস্ট সভ্যতার বর্বরতম হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে,
ওরা তোমাকে ইতিহাসের মানচিত্র হতে মুছে দিতে গিয়ে,
শতকোটি হৃদয়ে জীবন্ত করে দিয়েছে অসীম শ্রদ্ধাভরে।
সমগ্র বিশ্ববাসী আজ নিজেদের ধন্য মনে করে,
বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মহানায়ককে পেয়ে।
তুমি বাঙালি জাতির চির উজ্জ্বল মনিহার,
বাংলার পতাকা তোমার দেওয়া সোনালি উপহার।

লেখক : বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা), সহকারী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ, চাঁদপুর সরকারি কলেজ, চাঁদপুর

মা, তোমাকে বিনম্র শ্রদ্ধা

আবু সালেহ্ মুহাম্মদ নোমান

একাত্তর থেকে পঁচাশি
শহীদ জননী,
নিঃস্ব, রিক্ত তুমি আজ
জুরাইন কবরবাসিনী।
কাটিয়েছ চৌদ্দটি নিরন্ন অন্ধকার নির্জন
করুণ বছর,
পথ চেয়ে সন্তানের নীরবে-নিভৃতে অবসান
অপেক্ষার প্রহর ॥

অসমসাহসিকা পবিত্র আত্মা মা
তোমার সমাধিক্ষণ,
হঠাৎ একখণ্ড বিচ্ছিন্ন
মেঘের আগমন।
আলোকোজ্জ্বল শারদীয় দুপুর
আকাশ ঘন নীল,
সমীরণ সুগন্ধ মিষ্টি, সালোক বৃষ্টি
তাৎপর্য সীমাহীন ॥

চৌদ্দটি বছর পূর্বে ত্রিশ আগস্ট, ঠিক তোমার
দিবস অন্তিম,
শত্রু বাহিনীর হস্তে ধৃত 'আরবান গেরিলা' যোদ্ধা
সাহস অসীম।
পিতৃস্নেহ বঞ্চিত আজাদ তোমার
নয়নমণি সন্তান,
সয়েছে প্রচণ্ড নির্যাতন, জুগিয়েছ তুমি সাহস,
দেয়নি সহযোদ্ধাদের সন্ধান ॥

করেছে নিবেদন ক্ষুধার্ত সোনা একমুঠো ভাত সমীপে
জননী আমার,
ভাত নিয়ে বন্দিশিবিরে তুমি, চির অদৃশ্য শয্যা বঞ্চিত
খোকা তোমার।
ভাতহীন উদর, খেয়ে একবেলা রুটি
গুনেছ প্রহর,
শানের মেঝে বিছানা তোমার শীত-গ্রীষ্ম
চৌদ্দটি বছর ॥

সাফিয়াদের বিরোচিত ত্যাগে অর্জিত স্বাধীনতা জেনো
অনাগত বীর,
তারা বীর-সংশপ্তক, ন্যায়-অগ্রসেনানী চির
উন্নত শির।
তোমাদের রক্ত ইশতেহার গণতন্ত্র-সাম্য
মানবিক মর্যাদা,
স্বাধিকার স্বর্ণালি ক্ষণে মা, তোমাকে
বিনম্র শ্রদ্ধা ॥

(কথাসাহিত্যিক শ্রদ্ধেয় আনিসুল হকের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস 'মা' অবলম্বনে কবিতাটি রচিত)

লেখক : বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা), সহকারী অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ইডেন মহিলা কলেজ, ঢাকা
পিএইচডি গবেষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

দ্বিত্ব

এ এস এম মূয়ীদুল হাসান

কাশফুল যে রং ধারণ করে বুকে
রংধনুকেও ক্ষণিকে–ধূসর মনে হয়।

ছুঁয়ে ফেলা দিগন্ত
ধরা দিলে সহসা–কখনো তা মরীচিকা।

অথৈ সাগর জলে ভেসে থেকেও
অনিবারিত রয়–তৃষ্ণার সে জল।

ফিনিক্স পাখির মরণ;
মূল্যহীন করে দেয় বেঁচে থাকা অনেক জীবনকাল।

বিষেও যে বিষক্ষয়–
অবহেলার নয়;
কাঙ্ক্ষিত সে বিষ।

শূন্যতা সে? নাকি বিশালতা?

নীলকণ্ঠেরও আবৃত্তি–হয়ে ওঠে
শিহরণ জাগানিয়া।

নিত্যদিনের পরিচিত যে জটিল;
অজানা তার নির্মল সরলতা।

বেঁচে থাকা জীবন মৃত হয় কখনো;
প্রাণহীন কেউ বাঁচে হয়তো অনন্তকাল।

পূর্ণিমায় যে অমাবস্যা নামে;
তার চেয়ে বেশি আলো ছড়ায়
আর কোনো অন্ধকার?

নিজের মাঝে নিজে? নাকি অন্য কোথাও...?

লেখক: বিসিএস (কৃষি), উপজেলা কৃষি অফিসার, শ্রীপুর, গাজীপুর

তবুও নত হও প্রিয় কবিতারা

ডা. মধুসূদন মন্ডল

হে কবিতা! সম্ভ্রমহানির মাসুল দেওয়ার ক্ষমতা তোমার নেই।
তাই থেমে যাও, অথবা প্রার্থনা করো ফুরিয়ে যাক কলমের কালি।
অর্বাচীন যারা তোমাকে চালায়, করজোড়ে তাদের বলো, অপাঙ্‌ক্তেয় জীবনের মানে।

দ্বাবিংশ শতাব্দীর এই জীবন আঁচড়ে, তুমি বড়ই বেমানান!
তুমি মানতে পারো না সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশুর মৃত্যুর কারণ।
তুমি মেনে নাওনি অভুক্ত শিশুর মৃত্যু ক্রন্দন।

বৈশ্বিক মহামারির এই কর্কট সময়ে একজন প্রসূতি নারীর চাকরিচ্যুতি তোমাকে বড় বেশি অনুরণন দেয়, কী আজব!

কেন মানুষ খেতে পায় না, কেন আজও মানুষ ঈদের দিনে রোজা রাখে! এই প্রগলভতা রাখো।
তুমি থাকবে তাদেরই পৃথিবীতে অথচ প্রতিনিয়ত অনঙ্গ করবে, আত্মতৃপ্তিবোধের এই আসর বড় বেমানান!
তুমি থেমে যাও, অপাঙ্‌ক্তেয় ফুটপাতের জারজ সন্তানের মতো ক্ষুধার জ্বালায় চিৎকার করো। মরো।
তবুও আমাদের এই সভ্য সমাজে আস্ফালন দেখিও না।
যাদের বড় বেশি বিশ্বাস, মানুষের খুনে, অভুক্ত শিশুর ক্ষুণ্নিবৃত্তির অসম চিৎকারে।
দিন আনে মানুষের কথা বলতে তোমাকে বড়ই বেমানান লাগে, তবু লজ্জা নাই তোমার জনকদের।
অনর্গল বলে যাচ্ছে পাগলের কিচ্ছা।
আমরা বেঁচে থাকি, তোমরা মরে যাও, নির্মূল হও, মহাক্রান্তির মহালগ্নে কিছু বলিদান তো লাগেই, মেনে নাও।
তোমার জন্মদাতাকে বলো।
তবুও নত হও প্রিয় কবিতারা, তবুও নত হও।

লেখক : বিসিএস (স্বাস্থ্য), আবাসিক সার্জন, ইউরোলজি বিভাগ, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ও মিটফোর্ড হাসপাতাল, ঢাকা

রঙ্গমঞ্চ

নাফেয়ালা নাসরিন

আমরা কেবলই বিখ্যাত হতে চাই
মনে করি কেউ আমাদের পথ চেয়ে বসে থাক
হাত পেতে অটোগ্রাফ নিক
বেছে নেয়া সবচে' সুন্দর ফুলগুলো দিয়ে
তোড়া বানাক আমাদের জন্য।
আমরা কেবল আমাদের কথাই ভাবি
হয়তো এটাই আমাদের প্রকৃতি প্রবৃত্তি
অথবা হীনম্মন্যতা যা শুধু এককেন্দ্রিকভাবে
আমিত্বকে সবার মাঝে জাঁকিয়ে তোলে
সবটুকু হাততালি নিজের জন্য গুছিয়ে রাখে।

আমাদের ঠুনকো অহমিকা বোধ
বারবার নিজেকে বড় করবার প্রয়াস
ক্রমেই আমাদের চোখে ঠুলি পরিয়ে দেয়
ভুলে যাই পাড়ার মোড়ের বদ্ধ উন্মাদটাও
আমাদের চেয়ে শান্তির ঘুম ঘুমাতে পারে।
নিয়তির আঁকা ছকে উপলব্ধির কত বিচিত্র বর্ণ
যৌবনের শক্তিতে উদ্ভাসিত রহস্যময়
অথচ দিন শেষে পড়ন্ত বেলায় সবকিছু মলিন
ছানি পড়া চোখে জীবনের দিনলিপি সাদা-কালো
জীবনের রঙ্গমঞ্চে আমরা শুধুই খেলনা পুতুল।

লেখক : বিসিএস (তথ্য), উপ-পরিচালক, জেলা তথ্য অফিস, রাজশাহী

তোমার জন্য

মিজানুর রহমান

তোমার জন্য একলা দুপুর তপ্ত রোদে দাঁড়িয়ে থাকা
তোমার জন্য উজান সাঁতার জীবনটাকেই বাজি রাখা।
তোমার জন্য তোমার পাশেই চক্রাকারে ঘুরতে থাকা
তোমার জন্য বর্ষাদিনেও মুগ্ধ চোখে আকাশ দেখা।

তোমার জন্য হতে পারি ঝড়ের দিনের পূর্বাভাস
তোমার জন্য ছাড়তে পারি আমার সকল সর্বনাশ।
তোমার জন্য যখন তখন ছুটতে পারি দিগ্বিদিক
তোমার জন্য হিমালয়ের চূড়ায় একদিন উঠব ঠিক।

তোমার জন্য করোনাতেও নতুন করে বাঁচতে চাওয়া
তোমার জন্য বুকের বাঁ পাশ উথালপাথাল ঝোড়ো হাওয়া।
তোমার জন্য যেতে পারি সাগর তলের গভীর নীলে
তোমার জন্য দুঃখ আমার জীবন এত ছোট বলে।

তোমার জন্য ভাঙতে পারি অমানবিক সকল প্রথা
তোমার জন্য সংস্কৃতি আমার সকল কাব্যকথা।

লেখক : বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা), সহকারী অধ্যাপক (ইংরেজি), সরকারি বরহামগঞ্জ কলেজ, শিবচর, মাদারীপুর

ভালোবাসা পরিমাপযোগ্য হতো যদি

ডা. নিশাত রিজওয়ানা আশরাফী

পরম যত্ন সহকারে আর অতিশয় মোহনীয়ভাবে সৃজিত
তোমার শরীরে যেকোনো কারণে জ্বর আসার পরে
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা কত দাঁড়ায় তার সঠিক হিসাব পাওয়া যায়
থার্মোমিটারের ফারেনহাইট স্কেলের গায়।

তোমাকে সদা সর্বদা এভাবে হাসিখুশির মধ্যে বাঁচিয়ে রাখার জন্য
তোমার হৃৎপিণ্ড প্রতিনিয়ত সারা শরীরে যে রক্ত ছড়ায়
তা ধমনিগুলোর গায় যে হারে চাপ দেয়
তার ধারণা ধরা পড়ে ব্লাডপ্রেসার মেশিনের সাথে সংযুক্ত মিটারে।

সারা মাস ধরে বিদ্যুৎ বিভাগ প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ সরবরাহ করে
তোমাকে যে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দেয় তার বিনিময়ে কত টাকা বিল হয়
বৈদ্যুতিক মিটারে তার হিসাব পাওয়া যায়
আর পানির মিটারটি সারা মাসে পানি ব্যবহারের হিসাব জানায়।

মায়ের অতি সুরক্ষিত গোপন মাতৃজঠরে
কখন কীভাবে প্রাণের সঞ্চার হয়ে
জীবিত নাকি মৃত, পুরুষ নাকি মেয়ে সন্তান
কত দিন থেকে অবস্থান করে
আর দুনিয়ার মুখ দেখবে কত দিন পরে
অত্যাধুনিক আলট্রাসনোগ্রাম পরীক্ষার মাধ্যমে
ডাক্তার তার সঠিক হিসাব বলতে পারে।

তবে একজন প্রেমিক তার প্রেমিকাকে
স্বামী বা স্ত্র–দুজন দুজনাকে কত ভালোবাসে
তা পরিমাপের কোনো যন্ত্র দুনিয়ার কোথায়ও এখনো হয়নি আবিষ্কার–
এমনতর নিয়ম কেন হলো পৃথিবীতে
বলার সাধ্য আছে কি তোমার?

বিধাতা হয়তো মানুষের কল্যাণের জন্যই
এমন যন্ত্র আবিষ্কার হতে দেয়নি এ ধরায়।
আর তাই বৈজ্ঞানিকদের সৃজনশীল মাথা হতে
এ বিষয়টি খুব সম্ভবত বাদ পড়ে যায়।

যে যা-ই বলুক তার ধারণা মতে,
এটা মনে হয় ঠিক যে, ভালোই হয়েছে এতে,
কারণ, তোমার এত বেশি ভালোবাসার বিপরীতে
আমার ভালোবাসার পরিমাণ যে নিতান্তই অপ্রতুল–
এ কথাটি অনেক আগেই স্পষ্টভাবে সকলেই জেনে গেলে
ভীষণ লজ্জাস্কর একটি ব্যাপার ঘটে যেত তবে।

লেখক : বিসিএস (স্বাস্থ্য), ডেন্টাল সার্জন, ঢাকা ডেন্টাল কলেজ ও হাসপাতাল, ঢাকা

ফটো গ্যালারি

৮ম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানের কেক কাটা

৮ম বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে ক্যাডার অফিসারবৃন্দ

২৮তম বিসিএস ফোরাম আয়োজিত ফলাহার ১৪২৬

পথশিশুদের জন্য ফলাহার আয়োজন

৯ম বর্ষপূর্তি ও দশম বর্ষে পদার্পণ অনুষ্ঠানে আটাশের বন্ধুরা

২৮তম বিসিএস ফোরামের নতুন কমিটির অভিষেক ও পিঠা উৎসব

ফটো গ্যালারি

১০ম বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানের মঞ্চ

১০ম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানের কেক কাটা

পিঠা উৎসবে আটাশের নারী কর্মকর্তাগণ

পিঠা উৎসবে আটাশের বন্ধুদের একাংশ

সেলফিতে ফুরফুরে মেজাজে আটাশের বন্ধুরা

পিঠা উৎসব সমাপনান্তে আটাশের বন্ধুরা

ফটো গ্যালারি

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ইফতার মাহফিলে আটাশের বন্ধুরা

২৮তম বিসিএস ফোরামের সাধারণ সভায় বন্ধুরা

নারায়ণগঞ্জে ১১ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান

খুলনায় ১২শ বর্ষে পদার্পণ অনুষ্ঠান

বরিশালে ১১ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান

রংপুরে ১২ বছরে পদার্পণ উপলক্ষ্যে সম্মিলন

ফটো গ্যালারি

ময়মনসিংহে ১২শ বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষ্যে আনন্দ আড্ডা

রাঙ্গামাটিতে একাদশ বর্ষপূর্তি ও দ্বাদশ বর্ষে পদার্পণ অনুষ্ঠান

১২শ বর্ষে পদার্পণ উদযাপন করছে আটাশ ফোরাম

১২ বছরে পদার্পণ অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি সভায় আটাশ

প্রেসে স্যুভিনিরের কাজে ব্যাস্ত আটাশের বন্ধুরা

স্মরণিকার কাজের শেষক্ষণে প্রশান্তির হাসি

With The Best Compliments
from
KARNAFULY SHIP BUILDERS LIMITED

MV BAY ONE Cruise Ship
ONLY PASSENGER SHIP
CHATTOGRAM TO ST. MARTIN
ST. MARTIN TO CHATTOGRAM

KARNAFULY-EXPRESS
Cruise Ship
COX'S BAZAR TO ST. MARTIN
ST. MARTIN TO COX'S BAZAR

Registered Office
944/A, Strand Road, Majhighat,
Chittagong-400, Bangladesh
Phone: +88 031 616869, 627866, 2852315
Fax: +88 031 619519.

Dhaka Office
Flat#3C, House# 06 (NAM Village), Road#02
Banani, Dhaka-1213, Bangladesh
Phone: +88 02 8833911
Fax: +88 02 8824543

ksbldhaka@gmail.com http://www.ksblbd.com

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী, মুজিববর্ষ উদযাপন ও ২৮তম বিসিএস
ফোরামের ১২ বছরে পদার্পণ উপলক্ষ্যে

Trade Empire Limited.

Suite - A-1, Plot - 4/A, Road - 96, Gulshan - 2.
Email: md@tegbd.com

SM GROUP

SM Group of Companies Ltd.

21 YEARS OF CONTRIBUTION TOWARDS

- SOCIO ECONOMIC DEVELOPMENT
- EARNING FOREIGN CURRENCIES
- ERADICATING UNEMPLOYMENT &
- ASSISTANCE IN INDUSTRIALIZATION

sm knitwears

S M SPINNING MILLS LIMITED

Pizza Inn

MARINA

SMHOME Tex

SMARTEX
an ultimate fashion wear

SM ACCESSORIES LTD.
House Of Quality Trims And Packaging Solutions

Head Office : House : SE - 04, Road : 137 , Gulshan : 01, Dhaka : 1212
Corporate Office : SM Tower, House : 14, Road : 02, Section : 03, Uttara, Dhaka - 1230
Web : www.smknitwear.com, Email: smgroup@smknitwear.com
Phone : 02-55045035-36 , 01678016502 , 01614393125

TotalEnergies
নিশ্চিন্ত আর আস্থায়
নিরাপদ এলপি গ্যাস
TOTAL
12 kg LP GAS

Sonali eSheba
একাউন্ট খুলুন ঘরে বসে
বুয়েট ফি
ইনকাম ট্যাক্স
ট্রাভেল ট্যাক্স
ভ্যাট ফি
সোনালী ই-ওয়ালেট
এইচ এস সি ফি প্রদান
ই-পাসপোর্ট ফি জমা
একাদশ শ্রেণীর ভর্তি ফি
রেমিটেন্স তথ্য
ভর্তি ফি
সুরক্ষা অ্যাপস ব্যবহার

আর নয় লাইনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা!!!
Sonali eSheba মোবাইল অ্যাপে
মাত্র ২ মিনিটে ঘরে বসে অ্যাকাউন্ট খুলুন
Download Link
https://www.sonalibank.com.bd/SonaliSheba.php
সোনালী ব্যাংক লিমিটেড

যতবেশি রেমিট্যান্স, ততবেশি ক্যাশ!!

২%

রেমিট্যান্স প্রণোদনা নগদ অর্থ প্রদান

বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশী শ্রমজীবী মানুষের কষ্টার্জিত বৈদেশিক আয় বৈধ উপায়ে দেশে প্রত্যাবাসনে উৎসাহিত করার জন্য সরকার ২% হারে নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান করবেন। যতবার টাকা পাঠাবেন, ততবার ২% হারে অতিরিক্ত নগদ অর্থ পাবেন।

জনতা ব্যাংকের মাধ্যমে টাকা পাঠান

বেশি বেশি টাকা পাঠান
সাথে সাথে গ্রহণ করুন
২% নগদ টাকা

বেশি রেট, তাৎক্ষণিক জমা

ফরেন রেমিট্যান্স ডিপার্টমেন্ট
জনতা ব্যাংক লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়ঃ ১১০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
www.jb.com.bd
যোগাযোগঃ ০০৮৮-০২-৯৫১৫৩০৬, ০০৮৮-০১৭৫৬৫৭৩৬৪, ০০৮৮-০১৮২৭৯০৯৭০৩

DOWNLOAD NexusPay AND GO CARDLESS

NexusPay from Dutch-Bangla Bank, is the first fully cardless banking solution in Bangladesh. It offers:

Mobile Top-Up | Send Money | Bill Pay | QR/NFC Payment | Online Shopping | ATM Withdrawal | Mini Statement | Balance Enquiry

> **Attractive offers:**

1. Reward Points | 2. Cash Back | 3. Discount | 4. BOGO Buy 1 Get 1

> **How to pay:**

1. Open NexusPay app | 2. Scan QR and enter amount | 3. Get Notification

> **Add your:**

Nexus Debit Card I Rocket Account I Agent Banking Account I
VISA & MasterCard Debit and Credit card

NexusPay | 16216 | Dutch-Bangla Bank
YOUR TRUSTED PARTNER

OLiLA
Glassware
স্বচ্ছতায় শ্রেষ্ঠত্ব

বাংলাদেশের
সেরা গ্লাসওয়্যার

OLiLA Glass Industries Ltd.

Corporate Office : Tasin Nibash (2nd & 3rd Floor), House # 127, Road # 10, Block # C, Niketon, Gulshan # 1, Dhaka -1212, Bangladesh
Factory: Alisarkul, Bunabir, Sreemangal, Moulvibazar.
Contact: Tel: +880 2 9893961, Hot Line: 017 08 461500, 01708461523, 01708461528 Web: www.olilagroup.com

তেহারি
Tehari
/bloopbd
SUBSCRIBE
/bloop. TV
www.goldenharvestbd.com
/GoldenHarvestBD

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী, মুজিববর্ষ উদযাপন ও ২৮তম বিসিএস
ফোরামের ১২ বছরে পদার্পণ উপলক্ষ্যে

আন্তরিক শুভেচ্ছা

Head Office: 135/Ka, Shahid Nagar 1st lane, Lalbagh, Dhaka- 1211

Factory: Nishanbari, Kolatia, Keraniganj, Dhaka-1313

Tel: +88 02 9676196, Hotline: 01784357879

CUTS THE HEAT KEEPS YOU COOL

Sivaji Ray
E-mail : Sivaji.ray@saint-gobain.com
M: (+91) 9830980832 / (+880)1926295892

এখনই সময়

Bangladesh finance

Honored to achieve

ICAB National Award 2020 for **Best Presented Annual Report**
and **ICSB National Award 2020**
for **Corporate Governance Excellence**

These recognitions will surely drive us to our successful journey towards becoming the most prestigious financial institution in the country

bd.finance 16727

MODERN POLY INDUSTRIES LIMITED

Our Products

Draw Textured Yarn (DTY)

Draw Textured Yarn (DTY)

Sl No.	Nominal Denier	Luster	Actual Denier	% Elongation	Tenacity	% Shrinkage	End Use
1	50/24/00	Semi Dull	50±2	26±3	4.7±0.3	2.2±0.3	Weaving, Circular Knitting
2	75/36/00	Semi Dull	75±2	26±3	4.7±0.3	2.2±0.3	Warp Knitting, Circular Knitting, Weaving
3	75/72/00	Semi Dull	75±1.5	24±3	4.7±0.3	2.2±0.3	Circular Knitting,Weaving
4	100/36/00	Semi Dull	100±3	26±3	4.7±0.3	2.2±0.3	Circular Knitting, Weaving, Twisting
5	150/48/00	Semi Dull	150±3	25±3	4.0±0.3	2.3±0.3	Circular Knitting, Weaving, Twisting
6	150/96/00	Semi Dull	150±2	25±3	4.0±0.3	2.3±0.3	Circular Knitting,Weaving
7	300/96/00	Semi Dull	300±3	25±3	3.8±0.3	2.2±0.3	Weaving
8	50/24/R	Semi Dull	50±2	24±3	4.7±0.3	2.0±0.3	Circular Knitting, Weaving
9	75/36/R	Semi Dull	75±2	22±3	4.7±0.3	2.0±0.3	Weaving
10	75/72/R	Semi Dull	75±1.5	22±3	4.7±0.3	2.0±0.3	Weaving
11	75/144/R	Semi Dull	75±1	22±3	4.4±0.3	2.0±0.3	Circular Knitting, Weaving
12	150/48/R	Semi Dull	150±3	22±3	4.0±0.3	2.3±0.3	Circular Knitting, Weaving
13	150/96/R	Semi Dull	150±2	22±3	4.0±0.3	2.3±0.3	Circular Knitting, Weaving
14	150/144/R	Semi Dull	150±1	22±3	3.8±0.3	2.0±0.3	Circular Knitting,Weaving
15	300/96/R	Semi Dull	300±3	22±3	3.8±0.3	2.0±0.3	Weaving

Fully Drawn Yarn (FDY)

Fully Drawn Yarn (FDY)

Sl No.	Nominal Denier	Luster	Actual Denier	% Elongation	Tenacity	% Shrinkage	End Use
1	50/36	Bright	50±1	28±3	4.5±0.3	6.0±0.5	Warp Knitting Weaving, Twisting
2	75/36	Bright	75±2	28±3	4.5±0.3	6.0±0.5	Weaving, Twisting
3	108/36	Bright	108±3	28±3	4.5±0.3	6.0±0.5	Weaving, Twisting
4	120/36	Bright	120±3	28±3	4.5±0.3	6.0±0.5	Weaving, Twisting
5	150/48	Bright	150±3	28±3	4.0±0.3	6.0±0.5	Weaving, Twisting
6	300/96	Bright	300±3	28±3	3.8±0.3	6.0±0.5	Weaving, Twisting
7	450/96	Bright	450±4	28±3	3.8±0.3	6.0±0.5	Weaving
8	600/144	Bright	600±4	28±3	3.8±0.3	6.0±0.5	Weaving
9	75/36	Semi Dull	75±2	32±3	4.5±0.3	6.0±0.5	Warp Knitting, Weaving

Polyester Dope Dyed Yarn (Color)

Polyester Dope Dyed Yarn (Color)

Sl No.	Nominal Denier	Luster	Actual Denier	% Elongation	Tenacity	% Shrinkage	End Use
1	75/36	DTY, FDY	Any Shades	75±2	26±3	4.5±0.3	Weaving, Twisting
2	150/48	DTY, FDY	Any Shades	150±3	26±3	4.0±0.3	Weaving, Twisting
3	300/96	DTY, FDY	Any Shades	300±3	22±3	3.8±0.3	Weaving, Denim
4	450/96	DTY, FDY	Any Shades	450±4	22±3	3.8±0.3	Weaving, Denim

Polyester DTY Spandex Yarn (Lycra)

HEAD OFFICE :

BSM Centre (4th Floor),
119/122 Amir Market, Khatungonj,
Chittagong-4000, Bangladesh.
Tel : 031-610914, 620910,
Fax : 031-620545, 610841,
E-mail : modern@bsmgroupbd.com,
Website : www. modernpolybd.com

FACTORY :

P.A.B. Road, Char Patharghata,
P. S. Karnaphuli, Chittagong, Bangladesh.
Mobile : 01979-750081

Modern Poly Industries Limited (MPIL) has installed renowned machines to produce texturised yarns as per with the international standards. Well equipped with modern machineries which enable to produce intermingled/non intermingled texturised yarns confirming to international quality norms.

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী, মুজিববর্ষ উদযাপন ও ২৮তম বিসিএস
ফোরামের ১২ বছরে পদার্পণ উপলক্ষ্যে

KNITTEX INDUSTRIES LTD.

House-04, (ground & 1st floor), Road-13, Sector-04, Uttara, Dhaka-1230

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী, মুজিববর্ষ উদযাপন ও ২৮তম বিসিএস
ফোরামের ১২ বছরে পদার্পণ উপলক্ষ্যে

Law & Tax Care

Baitul Khair Building (9th Floor, Room # 907)
48/A-B, Purana Paltan, Dhaka-1000
Phone: 88 02-9550176, 01815-563642

SPREADING THE TASTE OF BANGLADESH
OVER 12 COUNTRIES & COUNTING

www.bangladeshifoods.com.bd

BANGLADESHI FOODS LIMITED

Corporate Office: 82/1, 4th Floor,
Road 2, Block A, Niketon, Gulshan 1
Dhaka 1217, Bangladesh
hello@b-dfoods.com
+880 2883 4887

Factory: 48, North Rajashon,
Savar, Dhaka 1340
www.bangladeshifoods.com.bd

mir CEMENT
নিশ্চিন্তে নির্মাণ

মীর কেয়ার
নির্মাণ সংক্রান্ত যেকোনো তথ্যের জন্য
16657 or 09612996600

Corporate Head Office:
House: B-147, Road: 22, Mohakhali DOHS, Dhaka 1206,
Phone: +880-2-22289335-9, www.mircement.com
www.facebook.com/MirCement

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী, মুজিববর্ষ উদযাপন ও ২৮তম বিসিএস
ফোরামের ১২ বছরে পদার্পণ উপলক্ষ্যে

Building A Better Tomorrow

Building A BAT Bangladesh is committed towards building
A Better Tomorrow with an evolved corporate purpose Tomorrow

BAT
BANGLADESH

British American Tobacco Bangladesh
New DOHS Road, Mohakhali
Dhaka-1206, Bangladesh
E: bangladesh@bat.com
T: (+880) 248811279 – 83

SUZUKI
MOBILITY & SAVINGS
BRINGS YOU THE BEST BUSINESS EFFICIENCY
GSX125 | Hayate EP
PRODUCT OF JAPAN
● LOW MAINTENANCE ● LOW FUEL COST ● LONG DURABILITY ● BRTA REGISTRATION SUPPORT ● NATIONWIDE SERVICE FACILITY
CALL 01704 120635 | f/suzukibd | RANCON MOTORBIKES

DOUBLE CHARGE
Porcelain Tiles
PERFECT FOR ALL THE ABUSES
IN HIGH TRAFFIC AREAS
HIGHLY DURABLE | 2-3MM THICK TOP LAYER | HIGH-GLOSS FINISH
Hotline: 080 00016609
www.akijceramics.net
/akijceramics
AKIJ CERAMICS
Promise of Perfection

NRBC PLANET

প্রবাসীর স্বপ্ন
এনআরবিসি ব্যাংক NRBC BANK

এনআরবিসি
আল আমিন
ইসলামিক ব্যাংকিং

ব্যাংকিং সেবা ও চিকিৎসা বিষয়ক
পরামর্শের জন্য ফোন করুন
24/7 16413
or
09612316413

NDE Ready Mix Concrete Ltd.
House- 22, Block -C, Road-4
Banani, Dhaka-1212

WeAssure
weassure.apbl@asianpaints.com
আল্টিমা
প্রোটেক শাইন
হাই শাইন ফিনিশ উইথ পিইউ টেকনোলজি
লেমিনেশন
এক্সটেরিয়র পেইন্ট
PU টেকনোলজি
১০
বছর
ওয়ারেন্টি*
PU
PU
ULTIMA
PROTEK SHYNE
asianpaints
হাই শীন
অ্যান্টি ফেডিং
asianpaints

Happy
NEW YEAR
2022
BEXIMCO
COMPUTERS LIMITED
আগামীর
ভাবনা আজই

একটি বিশ্বমানের
বাংলাদেশী কোম্পানি
2022
HAPPY
NEW YEAR
অত্যাধুনিক প্রযুক্তি
গবেষণা
সফটওয়্যার
আইসিটি অবকাঠামো
অটোমেশন
আইটি সার্ভিস...
GIGA TECH
www.gigatechltd.com

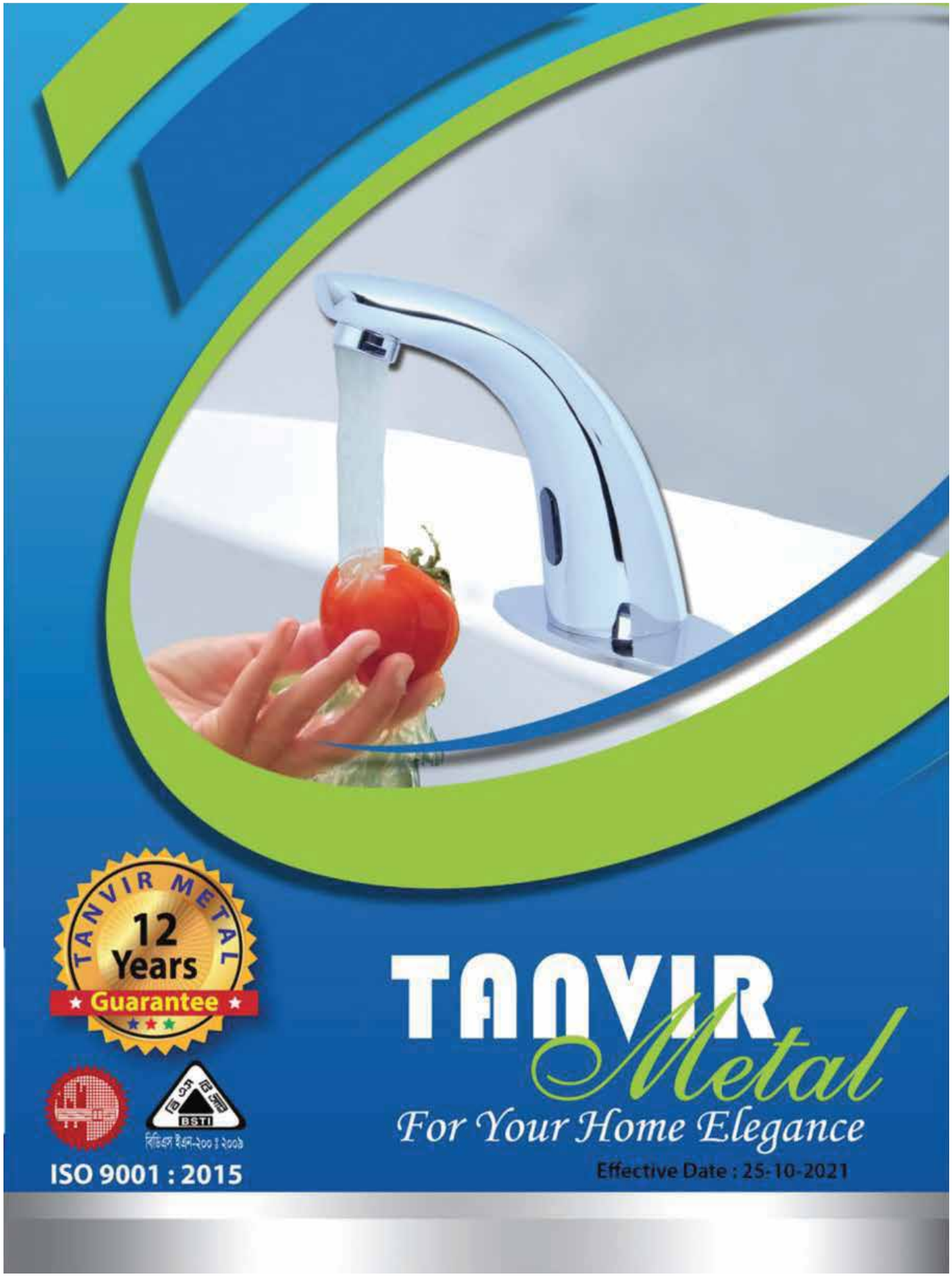
TANVIR METAL
12 Years
Guarantee
BSTI
ISO 9001 : 2015
TANVIR
Metal
For Your Home Elegance
Effective Date : 25-10-2021